বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রফিকউল্লাহ খান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
মোঃ মিয়ারুল ইসলাম
রেজিঃ নম্বর - ১৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪ - ২০১৫
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ - ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রফিকউল্লাহ্ খান
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
মোঃ মিয়ারুল ইসলাম
রেজিঃ নম্বর - ১৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪ - ২০১৫
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ - ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ মিয়ারুল ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য এই অভিসন্দর্ভটিকে গবেষণা পত্র হিসাবে জমা দেয়ার জন্য গবেষককে অনুমতি দেয়া হল।

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান
তত্ত্বাবধায়ক
এবং অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে "**বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা**" শিরোনামে এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপণ করলাম। অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির দৈতীয়িক সূত্রে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যতিত অবশিষ্ট উপস্থাপণ, বিশ্লেষণ ও বিরচনা আমার নিজস্ব।

মোঃ মিয়ারুল ইসলাম

মোঃ মিয়ারুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা: ০১

প্রথম অধ্যায়: যাত্রাশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ০৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ২৭

তৃতীয় অধ্যায়: সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালা ৪৩

চতুর্থ অধ্যায়: সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ৬০

পঞ্চম অধ্যায়: যাত্রাপালার চরিত্রায়ণ কৌশল ৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল ৯৩

সপ্তম অধ্যায়: যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেণিচরিত্র **১১২**

অষ্টম অধ্যায়: যাত্রাপালার পাঠক, দর্শক-শ্রোতাদের শ্রেণিচরিত্র **১২৩**

নবম অধ্যায়: যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব **১৩২**

উপসংহার ১৪১

পরিশিষ্ট ১৪২

সহায়ক গ্রন্থ ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

যাত্রাপালা বাঙালির একটি প্রাচীন নাট্যাঙ্গিক। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি যাত্রাপালা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র নাট্যরূপ লাভ করেছে। বাঙালির প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে নাটক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নাটক হিসেবে পরিচিত, সে আমাদের যাত্রাপালা। ধর্মাশ্রয়ী দেবগীতি কালের বিবর্তনে এক সময় যাত্রানাট্যের রূপ ধারণ করেছে। কোনো দেশের নাটক আকস্মিক গড়ে ওঠেনি। নাটক সৃষ্টির পিছনে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। ইংরেজ প্রবর্তিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বাংলা নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে যাঁরা এ কথা মনে করেন, তাঁদের একটি বিষয় উপলব্ধি করা উচিৎ যে, ইংরেজরা আসার পূর্বেও বাংলাদেশে জন বসতি ছিল। তাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চাও ছিল। বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাস চর্যাপদে বিধৃত আছে। চর্যাপদে যে নাটকের উল্লেখ পাই তাকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটকের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রথমেই আমরা যাত্রাপালার সন্ধান পাই। লোকনাট্য হিসেবে যাত্রার আবির্ভাব ষোড়শ শতকে। তারও কয়েক হাজার বছর পূর্বে যাত্রানাট্য শুরু হয়েছে বলে গবেষকেরা যে মত দিয়েছেন তার স্বপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ দেখানো সম্ভব নয়। এ কথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলা নাটক কয়েক হাজার বছর ধরে সাংগীতিক রূপে কাহিনী আকারে পরিবেশিত হয়েছে। গবেষকদের এ মত যদি সত্য হয়, তাহলে সাংগীতিক ধারায় দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা যে নাটকের সন্ধান আমরা পাই সে আমাদের যাত্রাপালা। কালের বিবর্তনে যাত্রাপালাগান ক্রমে যাত্রানাট্যের রূপ লাভ করে যাত্রাপালা নাম ধারণ করে। কালের বিবর্তনে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পালাগান নাটকে রূপান্তরিত হলেও তার শেষে গান ও পালা শব্দটি রয়ে গেছে।

আমার এ গবেষণায় আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যাত্রাপালাই বাঙালির আদি লোকনাটক। যাত্রাগানের মধ্যে গানের সংখ্যা বেশি থাকার কারণে অনেক গবেষক যাত্রাপালাকে নাটক হিসেবে মেনে নিতে চান নি। এ কারণে ঊনিশ শতকের পূর্বে বাংলা নাটকের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে বাঙালির নাটকের ধরণ গেয়। গেয় নাট্যধারার যতগুলো শাখা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হল যাত্রাপালা। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যাত্রাগানের প্রচলনের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যাত্রাপালা যেহেতু গ্রামীণ লোকনাট্য, তাই শিক্ষিত সাহিত্যিকদের থেকে সব সময় দূরে থেকে গেছে। যাত্রার বিষয়বস্তুও একান্ত লৌকিক বলে গ্রাম্য সমাজেই এর উৎপত্তি ও লালন। গ্রামের অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের বিনোদন মাধ্যম বলেই যাত্রা কোন কালেই ভদ্র সমাজের আনুকুল্য পায়নি। যেহেতু ভদ্র সমাজ যাত্রানাট্যকে গ্রহণ করল না তাই তাঁরা বাঙালির নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনিশ শতকের পূর্বেকার কোন নাট্যিক উপাদানই গবেষকেরা খুঁজে পেলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

আমি মনে করি উনিশ শতকের নাটকের ইতিহাস বাঙালির নাটকের ইতিহাস নয়। বাংলা নাটকের ইতিহাসের মূল রয়েছে আরও দূর অতীতে। বাংলা নাটকের চাক্ষুস ঐতিহাসিক সূত্র লোককাহিনী, রূপকথা, পালাগান, পাঁচালী গান, যাত্রাপালা প্রভৃতি নাট্যাঙ্গিকের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বাংলা লোকনাট্যের যতগুলো আঙ্গিকের সন্ধান আমরা পেয়েছি তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল যাত্রাপালা। তাই আমার এ গবেষণাকর্মে যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশসহ বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে লোকনাট্য যাত্রার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সরূপ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি। লোকনাট্যের ধারায় যাত্রাপালা কখন কীভাবে এবং কোন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কালের বিবর্তনের ধারায় যাত্রাপালার বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বে বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাঙালির ইতিহাস বিনির্মাণে যাত্রাপালার অবদান এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালার অবদান ও অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপালা কীভাবে তার স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তাই মূলত এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালা কী প্রভাব ফেলেছে এবং তার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপই কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালির গ্রামীণ জীবনধারায় জনমাধ্যম হিসেবে যাত্রাপালার অবদান কতখানি সে সকল বিষয়ের আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে যাত্রাপালার চরিত্রায়ণ কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য নাট্যাঙ্গিক থেকে যাত্রাপালার চরিত্রায়ণে কী ধরনের পার্থক্য লক্ষ কার যায় সে বিষয় নিয়ে অধ্যায়ের আলোচনা সীমাবদ্ধ আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাত্রাপালার অভিনয়কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ নাট্যধারার অভিনয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমূহ কী কী তা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাত্রাভিনয় কালে কোন ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বন করে থাকে এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে সেসকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনায় যাত্রাপালায় যে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে তাদের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামাাজিক মর্যাদা, ধর্ম, বয়স, নারী-পুরুষের অনুপাত কী রকম তা এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়ে যাত্রাভিনয় যারা দেখে সেসকল দর্শক-শ্রোতাদের শ্রেণি-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোন ধরনের এবং কোন বয়সের দর্শক যাত্রাভিনয় দেখেতে যায় সে সম্পর্কেও আলোনা করা হয়েছে। বয়সভেদে দর্শকদের রুচির বিষয়টিও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে যাত্রাভিনয়কে সমকালের প্রেক্ষাপটে বিচার করে একটি তুলোনামূলক আলোচনা এ অধ্যায়ে রয়েছে।

উপসংহারের আলোচনায় সমগ্র বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করে একটি যৌক্তিক পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশে যাত্রাপালার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যাত্রাপালা রচয়িতা ও অভিনেতাদের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি শনাক্ত করতে তাঁদের পালাসমূহ এবং সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি সংলগ্ন গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার এই স্তরটি হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্যায়ের। যাত্রাপালার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং যাত্রাশিল্পের বিষয় ও শিল্পরীতি মূল্যায়নে বিশ্লেষণাত্মক রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশ

ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোকনাট্য যাত্রাপালার ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ জাতির বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে, সাহিত্য নিদর্শন, শিল্পকলা ও ভ্রমণকাহিনীতে উল্লিখিত লোকনাট্যের প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিতকে বিবেচনায় নিয়ে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রাপালার ইতিহাস অন্বেষণ করা সম্ভব। লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম রূপ হল যাত্রাপালা, যা লোকনাট্যের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ধারা। আধুনিক যুগে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানা গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা হলেও যাত্রাশিল্প নিয়ে তেমন কোন বিস্তর আলোচনা লক্ষ করা যায় না। আধুনিক গণমাধ্যম ও মিডিয়ার প্রচার শুরুর পূর্বে গ্রামীণ জনগণের শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম উৎস ছিল এই লোকনাট্য যাত্রাপালা। বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেল ও টিভি মিডিয়ার প্রসার লাভ করার কারণে, ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্প আজ প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এসকল লোকজন একসময় শীতের রাতে দল বেঁধে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাত্রাপালা উপভোগ করতে যেত। বিভিন্ন ধাঁচের যাত্রাপালার মধ্যে এসকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সমরূপ ছবি দেখতে পেত। এসকল যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও তারা রাষ্ট্র, সমাজ, পারিবারিক বন্ধন, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, লোকদর্শন, সামাজিক সম্প্রীতিসহ নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত। এছাড়া সমাজের নানা অসঙ্গতির চিত্রও এসকল যাত্রাপালার মাধ্যমে তুলে ধরা হত।

বাংলা লোকনাট্য যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশের প্রাচীন কালের নাট্যচর্চা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলে নেয়া দরকার। আমাদের একাডেমিক নাট্যবিদগণের ধারণা ও বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় উপমহাদেশে নাটকের ইতিহাস মানেই হল সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস। আধুনিক নাটকের ইতিহাস বলতেও তাঁরা সম্ভবত হেরাসিম লেবেদেপ ও রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রবর্তিত ইউরোপীয় অনুকরণে রচিত ও অভিনীত মধুসূদন পরবর্তী নাট্যধারাকেই বুঝিয়ে থাকেন। সঙ্গত কারণেই বাংলা ভূখণ্ডের চিরায়ত নাটকের ইতিহাস আর আলোর মুখ দেখতে পেলো না। ফলে বাংলাদেশের প্রান্তিক অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের দ্বারা অভিনীত হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করা শিক্ষিত সাহিত্যিক মহলের কাছে চিরকালীনভাবে উপেক্ষিত রয়ে গেল। এ কারণে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস যথযথভাবে মূল্যায়ণ পেল না। প্রাচীনকালের দিগ্বিজয়যাত্রা হতে শুরু করে মধ্যযুগীয় গেয় ধারার মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালা সাহিত্যের সুবিশাল ভূমিখণ্ডে সাহিত্যিক মর্যাদা থেকে দূরেই রয়ে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

আর এ কারণেই বাংলা সাহিত্যে যাত্রাপালার ইতিহাস অলিখিতই রয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যে যাত্রাপালার সেই অলিখিত ইতিহাস হল বাংলা লোকনাট্যের ধারায় যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস।

ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের ধারায় যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস উল্লেখ করা যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে রচিত ঋগ্বেদের কথা।[১] ঋগ্বেদের মধ্যে বিভিন্ন সূক্তে বঙ্গভূমিতে প্রচলিত ও অভিনীত প্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডে দিগ্বিজয় যাত্রার বর্ণনা আছে যা থেকে জানা যায় সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের দিগ্বিজয় যাত্রায় তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন পার্শ্বচর থাকতো। এই পার্শ্বচরদের মধ্যে 'পুংশ্চলী' ও 'মাগধ'-এর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কেননা পুংশ্চলী হচ্ছে নারী–এই নারী ছিল নৃত্য-গীত পারদর্শী নটী এবং মগধ হচ্ছেন পুরুষ- যে পুরুষ ছিল বাদ্যকার–গল্পকথক নট। আর এই নট-নটীদ্বয় উভয়ে মিলে যুদ্ধের অবসরে নৃত্য-গীত ও অভিনয় দেখিয়ে সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের মনোরঞ্জন করতো। গবেষকদের ধারণা পরবর্তীকালে বাংলদেশের গ্রামীণ জনপদের মানুষদের মধ্যে সেই সব নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অনুশীলন প্রচার হয়েছে।[২] ঐ সকল নৃত্য-গীতের মধ্যে আধুনিক কালের যাত্রার উৎসমূল থাকতে পারে বলে আমরাও সহমত পোষণ করছি। এ ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা আজো গ্রামের অশিক্ষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা অভিনীত লোকনাট্য যাত্রাপালার মাধ্যমে টিকে রয়েছে বলে সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন:

> যাত্রা বিষয়ে বিচ্ছিন্ন যে আলোচনা পাওয়া যায় তাতে এর উন্মেষকাল নিয়ে ব্যাপক মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) মনে করেন, অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই রঙ্গভূমে যাত্রার প্রচলন ছিল।[৩] তাই বলা যায়, যাত্রাশিল্পের ইতিহাস বেশ পুরোনো। রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যাত্রাপালার আদি রূপ হিসেবে অভিমত দিয়েছেন ড. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।[৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে যাত্রা বিষয়ে প্রথম গবেষণা হয় ১৮৮২ সালে। গবেষক ছিলেন ড.নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ গবেষণা করেছিলেন। তাঁর রচিত অভিসন্দর্ভের নাম **"The Yatras or The Popular Dramas of Bengal"**। আমরা যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর মত যাচাই করে দেখতে পারি। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে তিন ধরনের মত দিয়েছেন। তাঁর তিনটি মতই আমরা আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করব। তাঁর অভিমত নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

The word Yatra is derived from the root ya-to go. Yatra therefore means, in the first place, a going, a departing ; e. g., Usha-yatra, leaving home at the earliest dawn ; maha-yatra, the great departure-i.e., death-hence a pilgrimage, e. g. Gaya-yatra, Prayaga-yatra, etc.

Secondly, yatra means a march, procession, e. g., Dola-yatra, Janmashtami-yatra, and Rasa-yatra-religious processions in connection with the history of the popular god, Krishna, which take place three times every year, in spring (Basanta), rainy season (Barsha), and autumn (Sharat).

Thirdly, Yatra means a species of popular dramatic representation, originally represented perhaps only in connection with the three religious processions named above, but gradually taking a more general meaning and a greater sphere of action.[৫]

অধ্যাপক সুশান্ত সরকার উপর্যুক্ত অংশটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন তাঁর 'যাত্রাঃ সেকাল একালের বিশ্লেষণাত্মক বিবেচনা প্রবন্ধে, অনুবাদ করে বলেছেন-

যাত্রা নামের উৎস হলো গমন করা অর্থে যা। সুতারং যাত্রা অর্থ হবে প্রথমত গমন,একটা স্থান ত্যাগ। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ ঊষাযাত্রা অর্থাৎ উষালগ্নে স্বগৃহ থেকে বের হওয়া; মহাযাত্রা অর্থাৎ মৃত্যু, গয়া যাত্রা অর্থে তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যাত্রা বলতে কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কোন শোভাযাত্রা বুঝায়। যথাঃ- দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী যাত্রা, রাসযাত্রা, যা বছরে তিন বার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যথাক্রমে বসন্তে, বর্ষায়, শরতে। তৃতীয়ত, যাত্রা বলতে এক প্রকার জনপ্রিয় নাট্যাভিনয় বোঝায়।[৬]

আমরা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতগুলো আলোচনার মাধ্যমে যাত্রার উৎপত্তি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি কি না দেখার চেষ্টা করি। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দেয়া তিনটি মতের প্রথমটি হল গমন অর্থে যাত্রা। ঊষাযাত্রার মধ্যে যাত্রার উৎপত্তি বিষয়ে এমন কোন নাট্যিক উৎস পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে গমন অর্থে যাত্রাকে লোকনাট্য যাত্রার আদিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গমন অর্থে যাত্রা নামের উৎসমূল তার মধ্যে থাকতে পারে বলে মনে হয়। তবে নাটক অর্থে ঊষাযাত্রাকে যাত্রানাট্যের পূর্বরূপ হিসেবে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। তাই আমি মনে করি গমন অর্থে ঊষাযাত্রা কোনভাবেই বর্তমান যাত্রানাটকের পূর্বরূপ হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যাত্রানাট্যের উৎসমূল মহাযাত্রা অর্থাৎ মৃত্যুযাত্রা ও গয়াযাত্রার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে, কারণ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয়রা জন্ম, মৃত্যু, তীর্থ এই তিনটি বিষয়ে নৃত্য-গীতকে ব্যবহার করে আসছে। শিশুদের জন্মে যেমন আনন্দগীতি, নৃত্যগীত গায়, তেমনি কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতেও তাঁরা ঢাক-ঢোল বাঁজিয়ে শব কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি গাইতে গাইতে শ্মশানে যাত্রা করে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রায় সর্বস্তরে নৃত্য-গীতের প্রভাব প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি সমানভাবে লক্ষ করা যায়। যেহেতু বর্তমান কালের নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালাতে নৃত্যগীতের প্রচলন আজও উপস্থিত আছে তাই মহাযাত্রা ও তীর্থযাত্রা ইত্যাদি আচারগুলোর মধ্যে আধুনিক যাত্রাপালার উৎসমূল সন্ধান করা একান্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মতকেও বিচার করে দেখতে পারি তার মধ্যে যাত্রার উৎমূল পাওয়া যায় কি না। দ্বিতীয় মতের ক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যেসকল যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলঃ শোভাযাত্রা, জন্মাষ্টমীযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি। ধর্মাচারকেন্দ্রিক এ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেও দলগত জনগোষ্ঠীর বাদ্য-বাজনা সহযোগে নৃত্য-গীতের প্রচলন বেশ লক্ষ করার মতো। তীর্থযাত্রা, মহাযাত্রার, চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী যাত্রানাট্যের উৎসমূল খুঁজে পাওয়া যাবে। মানবসমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন, বিকাশ ও পরিবর্তনের ধারা বিবেচনা করলেও এ সকল অনুষ্ঠানে যাত্রা শব্দটি উৎপত্তির সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রাপালার প্রাচীনকালের উৎস হিসেবে আমরা নিশিকান্তের দ্বিতীয় মতকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি।

নিশিকান্তের মতে যাত্রা বলতে এক প্রকার জনপ্রিয় নাট্যাভিনয় অর্থাৎ মধ্যযুগের ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে পূজামণ্ডপের সামনে বা আসর কেন্দ্রিক নাট্যাঙ্গিকের কথা বলেছেন । বিষয়টি তিনি নিজের গবেষণায় উল্লেখ রয়েছেন যা কৃষ্ণকোমল গোস্বামীর পালাসমূহের উল্লেখ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। একথা সত্য যে, দেবউৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা হতে যাত্রানাট্যের উদ্ভব হয়েছে। ঐ সমস্ত কাহিনী পরে যখন নির্দিষ্ট কোন স্থানে গায়েন দোহারদের মাধ্যমে রাতভোর অনুষ্ঠিত হয় তখন থেকেই মূলত যাত্রাপালা ধীরে ধীরে নাট্যিক রূপ ধারণ করে। এই লোকনাট্যই তৎকালীন অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রাম-গঞ্জের সরলমনা মানুষগুলোর বিনোদন ও নৈতিক শিক্ষার প্রধান বাহন হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। তাই আমি মনে করি যাত্রার উৎপত্তি বিষয়ে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে।

যাত্রাকে লোকনাট্য বলার পূর্বে লোকনাট্যের প্রকৃত লোক আসলে কারা তার স্বরূপ সন্ধান করা দরকার। প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে–"যাত্রা করে ফাত্রা লোক"। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি যে সকল অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত মানুষ তাঁদের নাট্যাভিপ্রায়ের মূলে কৃত্যকে স্থাপন করেছেন তাঁরাই লোক। প্রাচীনকালের নীতি ও দুর্নীতি এবং তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়ের মূল বিষয় হল দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। সে নাটকে হাসি তামাসা রঙ্গরস যাই থাকুকনা কেন, শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় মিথ্যার পরাজয় দেখানো হয়। যাদের নাট্যাভিপ্রায়ের মূল শিক্ষা দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে ঐতিহ্যকে তুলে দরা। গ্রামের কিংবা শহরের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যে অভিনয় করে ঐ সমস্ত অভিনেতা ও পালাকারদের আমরা যাত্রার 'লোক' বলে চিহ্নিত করতে পারি। যাদের কাছে অভিনয় পেশা নয় বরং নেশা তাদেরকেও আমরা 'লোক' বলব। আর এদের দ্বারা অভিনীত নাটককেই আমরা প্রকৃত লোকনাট্য চিহ্নিত করব। ব্যবসায়ী, অর্থলোভী, কালোবাজারী অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত পালাকার ও অভিনেতা যারা বাঙালির হাজার বছরের জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালাকে পঙ্কিলতায় লিপ্ত করেছে তাদের আমরা লোক বলে স্বীকার করব না।

সনৎকুমার মিত্র যাত্রা শব্দটি অভিনয়ের সাথে সংযুক্তির ব্যাপারে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি মূলত সূর্য দেবতার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমণকে কেন্দ্র করে কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠী তাদের নির্বিঘ্নে শস্য উৎপাদনের জন্য সূর্যের আয়নগতির দিকে লক্ষ রেখে যেসমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতো তা থেকে যাত্রার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষিনির্ভর প্রাচীন সমাজের মানুষেরা সূর্যের সেই যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতের সংমিশ্রণে যে অনুষ্ঠান পালন করতো সে বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে তিনি যাত্রাভিনয়ের স্বপ্নবীজের সন্ধান পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

> সূর্যদেবতার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে অভিগমনকে কেন্দ্র করে কৃষি নির্ভর সুপ্রাচীন সমাজ নিশ্চয় এমন সব উৎসব পালন করতো, যা তাদের সু-শষ্যের সহায়ক হতে পারে। সূর্যের আয়ন গতির দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যাবে যে, তার প্রধান গতি সঞ্চার কাছা-কাছি সময়ে এমন কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার সাথে 'যাত্রা' শব্দটি যুক্ত আছে। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দল বা ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা।... সূর্যের গতি পথের বিভিন্ন পর্যায়িক সঞ্চারই যাত্রা নামে পরিচিত। কৃষি নির্ভর প্রাচীনেরা সেই যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান করতো। এবং এই প্রক্রিয়া, বিশ্বাস ও আচারের মধ্যেই আজকের যাত্রাভিনয়ের নষ্টকোষ্টির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[৭]

বাংলার সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কে ডক্টর আহমদ শরীফ নৃত্য সংবলিত গীতিনাট্য বলে অভিহিত করেছেন।[৮] ড. সুকুমার সেনও জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যাত্রানাট্যের আদিরূপ বলে মনে করেন।[৯] এছাড়াও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা এ বি কিথ গীতগোবিন্দের মধ্যে যাত্রার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন বলে তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে লোকনাট্য হিসেবে যাত্রার অস্তিত্ব ছিল বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর লেখা "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অধ্যায়ে বলেছেন-

> প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঠিক নাট্যমঞ্চের উপযোগী নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিলনা, তবে সামিয়ানার নীচে বা মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকার দেবদেবীর লীলাকাহিনী বিষয়ক লোকাভিনয় বা যাত্রাভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।[১০]

যাত্রার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন–

> বেশধারী যাত্রা চরিত্রের ঈষৎ পূর্বাভাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিলবে; এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নৃত্যগীতাত্মক লোকনাট্যের পূর্বাভাস ফুটে উঠেছিলো এরকম অনুমান নিতান্ত অসম্ভব নয়। পরে যে সমস্ত কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো তাতে এক ধরণের লোকনাট্য পালাই অনুসৃত হয়েছিল।[১১]

বাংলাদেশের বিখ্যাত ফোকলোরবিদ আশরাফ সিদ্দিকীও গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যাত্রার প্রাথমিক উপাদান ও নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অথবা গীতগোবিন্দে বা অন্যত্রও আমরা গ্রামীণ আনন্দ-উৎসবের যে আভাস পাই, অনেকের মতে পরবর্তীকালে এইসবই নানা মটিফের (Motif) মিশ্রণে বর্তমানে যাত্রার রূপ নিয়েছে। যাত্রার দেবদেবী হিমালয় পর্বত থেকে নেমে এখন গ্রাম বাংলায় সহজ আসর করে নিয়েছে। রামায়ণ মহাভারতকে যদি বলা যায় সাহিত্যের রাজন্য পথ, এরিস্ট্রোক্রেসি তবে এখনকার যাত্রা নিতান্তই ডেমোক্রেসি, জন এবং গণ মানুষের কথা। এই জন এবং গণ-মানুষের ব্যথা-বেদনা এখন রামায়ণ, মহাভারত বা শাহনামার জমকালো পোশাক ভেদ করে আমাদের ঘরের কথাও বলতে চায়– কোনো 'ক্লাশ' নিতান্তই যেখানে মাসের কথাই এসে যায়। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, রাম, সীতা, কার্তিক, গণেশ– এমনকি সম্রাট আকবরও আমাদের সারিতে এসে যায়। জারি, কবি, যাত্রা- আমাদের আবহমান গ্রাম বাংলারই আনন্দঘন উৎসব যেন ছিল। মহরম, পূজা, ঈদ, নববর্ষ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে জমে উঠতো গান। আজ থেকে ৩০/৪০ বৎসর পূর্বের যেসব যাত্রাপালা ছিল –তা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক সব রকমই ছিল।[১২]

অমূল্যচারণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনে করেন অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল। তিনি মনে করেন রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে যাত্রার প্রচলন শুরু হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> বস্তুত যাত্রা হইতে আমাদের দেশের থিয়েটারের উৎপত্তি হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। যাত্রা নতুন জিনিস নয়। ইহার অস্তিত্ব প্রাচীনকাল হইতেই আছে। প্রাচীনকালে যাত্রা অর্থ দেবতা বিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশ বিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনো উৎসব। গ্রীক মেগস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মতো যাত্রা গান পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভারত নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতী-মাধবে ভগবান কলপ্রিয়নাথের যাত্রাভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসেবে মহাভারতে ঘোষ-যাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন-যাত্রা বন-ভোজন। ইহাতে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থার কথা বলা আছে। তাহার সঙ্গে একরকম অভিনয়ের কথা আছে। [১৩]

লোকনাট্য গবেষক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে যাত্রার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যাত্রাপালাকে লোকনাট্যের অতি প্রাচীন আঙ্গিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপঃ

> দেব উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীত ও শোভাযাত্রা (going in a procession) হইতে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং নৃত্য ও গীত ইহার দুইটি প্রাথমিক উপাদান। পূর্বে যাত্রাপালার সমস্ত চরিত্রের নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। [১৪]

প্রখ্যাত নাট্য ইতিহাস প্রণেতা আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের মধ্যে যাত্রার প্রাথমিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থ দুটি লোকনাট্য যাত্রার আদি উৎস হতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার অভিমত নিম্নরূপঃ

> জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীত শ্রেণির রচনা। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হত বলে ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কেবল মাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তবু শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়; কারণ, তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ করে তাকে 'নতুন যাত্রা' বলে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 'নতুন যাত্রা' কথাটি থেকেই পুরাতন যাত্রা কথাটি সম্ভবত:ই এসে পড়ে; মনে হয় মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হত বলে তাকেও সাধারণভাবে যাত্রা বলা হত।[১৫]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর যাত্রার যাত্রাপথ নামক প্রবন্ধে যাত্রাকে সামাজিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাঙালির ইতিহাসের মতোই যাত্রাপালার ইতিহাসকে দেখার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন-

> যাত্রা একটি সামাজিক দলিল। শিল্পরূপতো বটেই, সামাজিক দলিলও বটে। গ্রাম বাংলার দিনগুলো যে আনন্দহীন, রাতগুলো যে দীর্ঘ যাত্রায় আছে সেই খবর। যাত্রা গ্রামের মানুষকে, হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ দেয়। আনন্দহীন মানুষেরা যাত্রার পিছনে, সারারাত কাটিয়ে দিতে চায়, কেননা ঘরে ফিরে গেলে রাতগুলো বড় বেশি অন্ধকার, বেশি দীর্ঘ। যাত্রার প্রয়োজনের ইতিহাস গ্রামীণ জীবনের ইতিহাস আনন্দ ও বৈচিত্রহীনতার মধ্য থেকে উদ্ভূত। যাত্রাপালার আয়তনগত দীর্ঘতায়ই গ্রামীণ রাত্রির দীর্ঘতাই প্রতিবিম্বিত।[১৬]

ড. সুভাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় নানা গেয় আখ্যানের রূপান্তরিত নাট্যিক রূপ থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন-

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ঢপকীর্তন, মঙ্গল কাব্য, ঝুমুর ইত্যাদি নাট্য ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে কবি গান, পাঁচালী, তর্জা ইত্যাদি লোকাভিনয়ের একটি ধারার প্রবাহিত হয়ে আসছিল তারই সার্থক প্রকাশ যাত্রার মধ্যে। যাত্রা লোকাভিনয়ের একটি যথার্থ নিদর্শন।... সুতরাং বেশ অনুমান করা চলে ঊনবিংশ শতকের বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে লোকাভিনয় ধারা প্রচলিত ছিল। 'গীতগোবিন্দ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার প্রাথমিক পরিচয় আছে। পরে ঝুমুর কীর্তন, ঢপকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, কবিগান, পাঁচালী, তর্জা, যাত্রার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে আধুনিক কাব্য ধারায় সংমিশ্রিত হয়েছে।[১৭]

কিন্তু সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে যদি যাত্রার সৃষ্টিকাল হিসেবে মানতে হয় তাহলে যাত্রানাট্যকে ঊনিশ শতকের নতুন নাট্যাঙ্গিক বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু যাত্রাপালা এতো নতুন নাট্যিক অনুসঙ্গ নয়। আমার মনে হয় উনি যাত্রা বলতে ঊনিশ শতকের আধুনিক যাত্রাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, যাত্রানাট্যের বর্তমান রূপটি একটি বিশাল বিবর্তনের ফল। কাজেই সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না।

ড. সেলিম আল দীনের গবেষণা গ্রন্থটি অনুপুঙ্খ পাঠ করলে আমরা তাঁর উদাহরণ দিয়েই যাত্রাপালার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে পারি। 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' গবেষণা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীনকালের বাংলা নাটকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

> নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি। নৃত্যকে করেছে তার ধমনী। কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ–তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেও বাংলা নাটকের রূপও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব,-ধর্ম-চণ্ডী-মনসা-গাজী-মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বনে যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা-আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। কৃত্যকে বাদ দিয়ে বাংলা নাটকের রূপ-রীতি অন্বেষণ নিরর্থক বলেই প্রতিয়মান হবে। এমনকি প্রাচীন পুর্ববঙ্গ বা মৈমনসিংহ গীতিকা যা সচরাচর-আত্মপলুব্ধ মানব-মানবীর পালা রূপে পরিচিত–তার মধ্যে কোনো কোনোটি আজও বৃষ্টি নামাবার উপায় হিসেবে খরাকালীন লোকজ কৃত্যের আশ্রয়ে পরিবেশিত হয়।[১৮]

আমার মনে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন, কারণ কৃষ্ণবিষয়ক লীলাকে অবলম্বন করেই যাত্রানাট্য উৎপত্তি, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। অন্যদিকে লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালের জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালার সূত্রপাত হয়েছিল এবং তা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। এ কারণেই হয়তো তিনি নিজ গবেষণা কর্মের প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণবিষয়ক সাহিত্যকর্মকে আলোচনায় আনেন নি। তবে তাঁর গবেষণার শরুতেই অসতর্কতাবশত নাটকের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে যাত্রাপালাকে নাটকের চেয়ে প্রাচীন বলে উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি সে পালাসমূহকে সম্ভবত লোকনাটক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান নি। যাত্রাপালা থেকে পরবর্তী কালে লোকনাটকের জন্ম হয়েছে এমন কথা তাঁর গবেষণা গ্রন্থের মধ্যেই তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন:

> বাঙলা নাটকের প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটক কথাটা প্রায় দুর্লভ। বুদ্ধ নাটককে নাটক বলা হলেও তা নৃত্যগীতেরই আঙ্গিক। আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো ন্যারেটিভ ও রিচুয়াল থেকে পৃথকীকৃত চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান-পাঁচালি-লীলা-গীত-গীতনাট-পালা-পাট-যাত্রা-গাম্ভীরা-আলকাপ-ঘাটু-মঙ্গলনাট-গাজীরগান ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বাঙলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। শুদ্ধ সংলাপ ও চরিত্রাভিনয়ের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের নাটকে দূর্লভ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটক–পাঁচালী –লীলানাট– গীতনাট– নাটগীতপালা প্রভৃতি প্রধানত মৌখিক রীতিতে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে – বাঙলা নাটকের অভিনয়রীতি ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্পূর্ন অভিনয়রীতি থেকে পৃথক।[১৯]

এখন ভাবনার বিষয় হল জনাব সেলিম আল-দীন একবার বলেছেন নাটক অর্থে যাত্রাপালা আঠারো শতকের পূর্বে বিদ্যমান ছিল না, আবার একই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই স্বীকার করে নিচ্ছেন নাটকের উৎপত্তি হয়েছে যাত্রা থেকে। আমার প্রশ্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগে যাত্রা যদি নাটক অর্থে ব্যবহার না হয়ে থাকে তাহলে তিনি কেন স্বীকার করলেন যে বর্তমান নাটকের পূর্বসূরী যাত্রাপালা, পাঁচালি ও অন্যান্য লৌকিক বিষয়াদি। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানের পরিধি নিয়ে তাঁর মতো বড় মাপের গবেষকের মতামত নিয়ে তর্ক করা চলে না, তথাপি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে তো পারি, সেটুকুই করছি। আর নিজ ভুলের জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথমত "মধ্যযুগের বাংলা নাট্য" গ্রন্থের বহুসংখ্যক স্থানে 'গেয়' শব্দটা সঙ্গীত কিংবা সাহিত্যে সাঙ্গীতিক বাচনভঙ্গি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ

Dhaka University Institutional Repository

কারণেই প্রাচীন জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালাকে নাটক থেকে পৃথক করে অর্বাচীন প্রমাণ করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। এছাড়াও তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটকের কোন নাম দেন নি, সে নাটককে তিনি লোক নাটক হিসেবে হয়তোবা মানতে নারাজ; তবে সংস্কৃত নাটক সে নাট্যাঙ্গিক থেকে যে ভিন্ন ছিল, একথা তিনি স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে প্রাচীন ও মধ্যযুগে নৃত্যগীতের যে প্রাবল্য ছিল তা বর্তমান কালের যাত্রানাট্যে যেভাবে অদ্যাবধি অক্ষুন্ন আছে অন্য কোন নাটকে তা বিরল। প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি একমাত্র যাত্রাপালাতেই পুরুষেরা নারী চরিত্রে অভিনয় করে আসছে। সে কালেও রামায়ণের কাহিনী অভিনয়কালে পুরুষেরা সীতা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রাপালায় রাধা, বড়াই, রুক্মীনি ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় করতেন তার প্রমাণও আমরা সেলিম আল দীনের গ্রন্থে পাই।

> হেন রামায়ণ-নট নাচিল নর্ত্তকে / মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যকে। এথেকে প্রমাণিত হয় উক্ত নাট্যে নটেরাই স্ত্রীবেশ ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে ঘাটু প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নাট্যে পুরুষদের (মূলত কিশোর) স্ত্রীবেশ ধারণ করাটা একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য হিসেবেই অনুসৃত হয়ে আসছে। বিবরণ দৃষ্টে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে– চরিত্রানুগ অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও বর্ণিত রামায়ণাভিনয় হেন রামায়ণ-নট নাচিল নর্ত্তকে ছিল। এ রীতি বাঙলা নাট্যাভিনয়ের সহস্র বছরের ধারার সঙ্গে নিতান্তই সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু চরিত্রাভিনয়ের যে উল্লেখ এতে পায় তা অভিনব। কারণ চৈতন্যদেবের পূর্বে চরিত্রাভিনয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত অংশ ছাড়া অন্য কোথাও লভ্য নয়। সেক্ষেত্রে বাঙলা নাট্য পরিবেশনার রীতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।... তাছাড়া – এ ধরনের নাট ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণকারী সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেশিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ – বাঙলা নৃত্য বা নাট্য কখনই ভারতশাস্ত্রের অনুবর্তী ছিল না– এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।[২০]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে "ঘাটু প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী নাটক" প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী কথাটার মধ্যে মূলত ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় লোকনাটক যাত্রাপালাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই 'প্রভৃতি' শব্দের লোকনাট্য যাত্রাপালারই সমরূপ দেখতে পাবেন।

এখন আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আধুনিক কালের পাঠকদের কাছে যাত্রাপালা ও নাটকের প্রাচীনত্ব নিয়ে একালের গবেষকদের মধ্যে যে বিতর্কের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে তারও একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান মিলবে। বিষয়টি হলো ডক্টর সেলিম আল দীন তাঁর গবেষণা কর্মের দ্বৈতিক উৎস হিসেবে যে সকল গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন এবং যে গ্রন্থ থেকে তিনি নিজ গবেষণা কর্মের জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন সেটি হল: শশিভূষণ দাশগুপ্তের "বাংলা সাহিত্যের নবযুগ"। এ বই থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে কোন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন না করেই নাটকের

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম রহস্যের যে কাহিনী তিনি ফেঁদেছেন তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধিতে অযোক্তিক বলে মনে হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্তের বই থেকে তিনি নাটকের উৎপত্তি ও বিবর্তনের উদ্ধৃতি হুবহু ব্যবহার করেছেন। দু'টি গ্রন্থের তুলনামূলক অধ্যয়ন কালে পাঠকগণ সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন বলে আমার মনে হয়। নাটকের উৎসমূল নির্দেশ করতে গিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত কী মত ব্যক্ত করেছেন আমরা তাঁর বইয়ের কিছু অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে নিয়ে তুলোনা করে দেখতে চাই। তিনি বলেছেন–

> কিন্তু এস্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন, এই যে এত সাড়ম্বরে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার নাট্য-সাহিত্যের কথা বলা হইতেছে, ইহা কি ? সেই-ত ঘুরিয়া ফিরিয়া পাঁচালী, কবি, তর্জা, হাফ-আখড়াই, আর যাত্রা? এই যাত্রাগান সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত-মহলে একটা উন্নাসিক অবজ্ঞার ভাব অতি স্পষ্ট। যাত্রা-গান বলিতে অনেকেরই ধারণা, ইহা অষ্টাদশ শতকের প্রাকৃতগণ-মনোরঞ্জনের জন্য তৈয়ারী একটি সস্তাদরের খিচুড়ি; ইহা বাঙলা-সাহিত্যের প্রাণধর্মের কোনো গভীর পরিচয় বহন করে না; বাঙলা-সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের ভিতরে ইহার তেমন কোনো সুদূরপ্রসারী মূল্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্যই ইহারা মনে করেন, আমাদের নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস মুখ্যতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ, বিংশ শতাব্দীতে তাহার বিস্তার। আমাদের বিচারে বাঙলা-নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি মনোভাব ভ্রমাত্মক।[২১]

অর্থাৎ যাত্রা যে লোকনাট্যের একটি অতি প্রাচীন আঙ্গিক তা মূলত শশিভূষণ দাশগুপ্তের এ উক্তি থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায়। শুধু তাই নয় তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যেও লোকনাট্য যাত্রাপালার সমরূপ দেখতে পেয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন:

> গীতগোবিন্দের যে সকল সুরতালের নির্দেশ রহিয়াছে তাহাদের সহিত নৃত্যের সহজ যোগ আছে। বিষয়বস্তুটি যেমন বর্ণনার ভিতর দিয়াও ফুটিয়াছে, তেমনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্ণযাত্রা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আমরা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাই। সেখানে কৃষ্ণের কংসবধ এবং বিষ্ণুর বালিকে পাতালে বদ্ধ করিবার উপাখ্যানের উল্লেখ পাই। এই অভিনয় কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; কেহ বলেন মুকাভিনয় ছিল, কেহ বলেন বিভিন্ন চরিত্রের অংশ লইয়া ইহা

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যাভিনয়েরই একটি স্থূল রূপ ছিল। আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে এই কৃষ্ণযাত্রারই একটা পরিণতি দেখতে পাই।[২২]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, ইত্যাদির মধ্যেও শশিভূষণ দাশগুপ্ত যাত্রাপালার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তিনি যাত্রানাট্য হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেষণা রীতির মধ্যে তিনি লোকনাট্য যাত্রাপালার অভিনয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন বলেও মত দিয়েছেন।
তিনি লিখেছেন:

> জয়দেবের পরে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিতরে পাওয়া যায় সেই কৃষ্ণযাত্রারই পরিণতি। এখানে কৃষ্ণযাত্রাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে; প্রত্যেকটি 'খণ্ড' স্বয়ংসম্পূর্ন পরবর্তী কালের নাট্যাভিনয়ের ভাষায় প্রত্যেকটি খণ্ডকে বলা যাইতে পারে এক একটি পালা। প্রত্যেক খণ্ডের প্রত্যেকটি পদই সুরতালাদির সহিত গেয়। কৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই, এখানে যে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কতগুলি আখ্যানই রহিয়াছে তাহা নহে; এই আখ্যানের ভিতরে কবির বর্ণনা অপেক্ষা বর্ণিত চরিত্রগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তি ভিতর দিয়াই ঘটনাটি আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে অধিক। নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা এবং মধ্যবর্তিনী বড়াইবুড়ীর সংলাপ বিষয়বস্তুকে অগ্রগতি দান করেছে। স্থানে স্থানে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি স্পষ্টভাবেই নাট্যধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।[২৩]

আধুনিক নাটক অপেক্ষা লোকনাট্য যাত্রার প্রাচীনত্ব নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্য গবেষকের এতসব অভিন্ন মতামতকে আমলে না নিয়ে ডক্টর সেলিম আল দীন কেন লোকনাট্য হিসেবে যাত্রাপালাকে মানলেন না, সে বিষয়ে আমার প্রশ্ন রইলো নতুন প্রজন্মের গবেষকদের কাছে। আমার ধারণা শিক্ষিত সাহিত্যিক সমাজের যাত্রাপালার প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা ভাবই ডক্টর সেলিম আল দীনকে এধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।
আসকার ইবনে শাইখ যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আনুমানিক দুহাজার বছরের নট্যাঙ্গিক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

> হীনাবস্থায় পড়লেও যাত্রা প্রথমেই খাঁটি স্বদেশিকতার গর্ব করবে, করে ইঙ্গিত করবে নাটকের স্বকীয়ত্বের প্রতি। আর তা করলেও খুব একটি অন্যায্য হবে তা নয়। আমাদের নাটকের কথাটাও এসে পড়বে। আর তখনি মালুম হবে যে, যাত্রাও নাটকের পরিচয় শুধু দু'বছরের নয়, দু'হাজার বছরেরও বেশি। এবং যেহেতু দুহাজার বছরেরও অধিক বছরের ওপার থেকে কথাটা আরম্ভ করতে হচ্ছে, সেহেতু সংস্কৃত নাটকের

Dhaka University Institutional Repository

> পাশাপাশি গ্রীক নাটকও এসে দাঁড়াবে। তাই যাত্রা, সংস্কৃত নাটক এবং গ্রীক নাটক – এই তিনের টানেই হয়েছে তে-টানার সৃষ্টি।[২৪]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর আহমদ শরীফ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দকে' নৃত্য সংবলিত গীতিনাট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৩] ডক্টর সুকুমার সেন 'গীতগোবিন্দকে' পালাগান মনে করেছে্ এবং একইসংঙ্গে তিনি 'গীতগোবিন্দকে' যাত্রাপালার আদি রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। [২৫] জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী যিনি ছিলেন মন্দিরের সেবিকা তিনি এ নাটগীতে নাচতেন বলেও গবেষক মনে করেন। [২৬]

ড. সাইমন জাকারিয়া তাঁর 'বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র, গন্থে লোকনাট্য যাত্রাপালার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যাত্রা শব্দটি অতি প্রাচীন হলেও সেই যাত্রার ধরণ বর্তমান কালের যাত্রাপালার মতো ছিল না। তিনি মনে করেন সে সময়ে যাত্রা আচার কেন্দ্রিক ছিল। প্রাচীন কালে যাত্রাপালার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলেও যাত্রার মতো গীতিবহুল একধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রচলন ছিল বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> বাংলা ভাষার 'যাত্রা' অর্থ গমন। এই অর্থের সাযুজ্য ধরে এসেছে 'যাত্রাগান' বা যাত্রাপালা। দূর অতীতে তিথি বা নক্ষত্রযোগে কোথাও গমন অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির প্রচলন ছিল এবং সেই যাত্রার ধরণ ছিল অনেকটা শোভাযাত্রার মতো। তবে, প্রাচীনকালে নাট্যরীতি 'যাত্রাগান' বা যাত্রাপালা হয়তো ছিল না, কিন্তু গীতবাহুল এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রচলন ছিল। [২৭]

যাত্রা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রথম গবেষক তপন বাগচী যাত্রার উৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে মনে করেছেন যাত্রার উৎপত্তি হয়েছে ষোড়শ শতকে। এ মতের প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়কে যাত্রাভিনয়ের যথার্থ দালিলিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন লৌকিক অভিনয়ে প্রথম সূতিকাগার শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি বলেন-

> শ্রী চৈতন্যদেবের অভিনয়কে যথার্থ অর্থে যাত্রাভিনয়ের বীজ হিসেবে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। উৎসব অর্থে যাত্রা বা শোভাযাত্রার উন্মেষ হয়ত মানব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অভিনয়কলা অর্থে যাত্রার বীজ উপ্ত হয় ষোড়শ শতকে। এ সময়ে যাত্রা ছিল আসরে বা চাতালে।[২৮]

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্য গবেষক অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিন্মোক্ত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন–

> আমাদের দেশে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবপূজা উপলক্ষ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা বা গমন থেকে। এই যাত্রার সময় গীত এবং নৃত্যের ভঙ্গিতে অঙ্গ সঞ্চালন হত। নৃত্যগীত সংবলিত যাত্রার নাম তখন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল নাটগীত বা গীতনাট। ধর্মীয় শোভাযাত্রা গন্তব্য স্থলে পৌছিয়ে নৃত্যগীত এবং ভাব প্রকাশক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে দেবলীলার মহিমা ব্যক্ত করত। কালক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে শোর্তৃমণ্ডলী বেষ্টিত অভিনয়ই যাত্রাভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। নৃত্যগীত ও অঙ্গভঙ্গি বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত না হয়ে একটি কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হল এবং তার মধ্যে কিছু হাস্যরসাত্মক সংলাপ যুক্ত হল। এভাবে যাত্রানাটকের উৎপত্তি হল। [২৯]

অমূল্যভূষণ বিদ্যাচরণ মনে করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ঐ সময় লোকনাট্য যাত্রা উদ্ভব হয়েছে। তিনি মূলত শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য যে সংকীর্তন ও কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রাভিনয়কে যাত্রার উদ্ভব কাল হিসেবে মনে করেছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সময় হইতেই বোধহয় বর্তমান যাত্রার আবির্ভাব। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যই সংকীর্তণ ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্বেও বাঙলায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয়ের ব্যপারের প্রবর্তক মহাপ্রভু। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের আঙিনায় আসর করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজে স্ত্রীবেশে শাড়ী, হার বলয় নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিম বেণীতে সুসজ্জিত হইয়া সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতেই এই যাত্রাভিনয় হইয়াছিল, চারিদিকে দর্শকের স্থান হইয়াছিল।[৩০]

বিশিষ্ট যাত্রাগবেষক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য দ্বাদশ শতাব্দীতে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি যাত্রার প্রাথমিক রূপ জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে এমন মতও ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন-

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতণ্যের অভিনয়লীলা ইত্যাদি সাক্ষ্যে যাত্রাগানকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ বা তার পূর্বকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালির নাট্যরাস পিপাসা নিবৃত্তির অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। [৩১]

লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে জসীম উদ্‌দীনের অভিমত নিম্নরূপ:

যদিও ইউরোপের মত আদর্শে আমাদের দেশে নাটক তৈরি হয় নাই কিন্তু এক রকমের নাটক আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সে আমাদের গীতিনাট্য। যাত্রাগানের মধ্যে বিভিন্ন জেলার লোকনাট্যের মধ্যে, আমাদের দেশের যে নাট্যধারাটি প্রবাহিত হইতেছিল তাহার প্রকাশভঙ্গিমা অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে কোন শক্তিশালী লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। ... পূর্ববঙ্গের গ্রামে আমাদের লোকনাট্যের যে ধারাটি এখনও স্বতঃ প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে তাহার জন্য আমরা গৌরব করিতে পারি।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে কপিলা বাৎসায়ন যে মত ব্যক্ত করেছেন, তাতে মনে হয় যাত্রানাট্য ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতকের কোনো এক সময় উদ্ভাবিত অর্বাচীন নাট্যাঙ্গিক। তিনিও যাত্রার উদ্ভাবকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অভিনয় অনুসঙ্গের সঙ্গেই সম্পৃক্ত মনে করেছেন।

তাঁর 'ভারতের লোকনাট্য ঐতিহ্য' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন-

> ষোড়ষ ও সপ্তদশ শতকে চৈতন্যের একই আন্দোলন থেকে দুটি স্রোতধারার উদ্ভব হয়। এর একটি হল কীর্তনগান, অন্যটি হল কৃষ্ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে ঘিরে নাট্যাভিনয়সমূহ। পরে মনিপুরও এই দুটি শিল্পরূপকে গ্রহণ করেছে। এভাবে আমরা দুটি অঞ্চলেই কীর্তন সঙ্গীতের সুস্পষ্ট ঐতিহ্যকে পাই, আর পাই যাত্রাভিনয়কে।[৩৩]

অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর যাত্রা বিষয়ক গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সংস্কৃত নাটকের অনেক পূর্ব থেকেই যাত্রানাট্যের উৎপত্তি হয়েছে বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন-

> পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকেরা এই প্রকারের ভক্তিমূলক আমোদ-প্রমোদে উল্লাসিত হত। তারপরেই সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য এবং প্রভাব অনুভূত হতে লাগল এবং যাত্রাও নতুনভাবে রূপায়িত হতে লাগল। প্রবেশ বহিরাগমন দুই দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতি, সাজসজ্জা এবং আরও নানা প্রকার শিল্প সংক্রান্ত খুটিনা'টি বিষয় ক্রমশ এতে সন্নিবেশিত হল। গদ্যের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো গান দিয়ে রচিত হোত।[৩৪]

যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে বিশিষ্ট লোকনাট্য গবেষক প্রভাতকুমার গোস্বামী মত নিম্নরূপ:

> ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে উপ্ত হয়েছিল; তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্করিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা নানা শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়। যাত্রার জন্মটা আগে হলেও তার বিকাশ ঘটেছে থিয়েটারের পাশাপশি।[৩৫]

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' গ্রন্থে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তিনি মূলত যাত্রার উদ্ভব বলতে অভিনয়কলা হিসেবে যাত্রার উদ্ভবের কথাই বলেছেন। বিশেষ করে নাট্যিক আঙ্গিকে যাত্রার আদিম গেয় ঢং পরিবর্তন করে একাধিক চরিত্রের দ্বারা লোকনাট্য যাত্রার রূপান্তরকে মূলত যাত্রার উদ্ভব হিসেবে দেখেছেন। মৈত্র মহাশয়ের মতামত নিম্নরূপ:

> আমাদের মতে ষোড়শ শতকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল; অষ্টাদশ শতকে যাত্রা সাধারণ প্রমোদকলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। রাঢ়ের ভক্তি-প্লাবিত অঞ্চলে জন্মলাভ করে কলকাতায় যাত্রা যে আসর জাঁকাতে পেরেছিল, ধর্মীয় নিরপেক্ষতাই তার কারণ।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত গবেষকদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাত্রার উদ্ভবকাল নিয়ে গবেষকগণ একমত পোষণ করেন নি। তবে বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন দ্বাদশ শতকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যাত্রানাট্যের প্রাচীন রূপ বলে দাবিও করেছেন। অন্যদিকে আর একদল গবেষক মনে করেন যাত্রানাট্যের উদ্ভব হয়েছে ষোড়শ শতকে বা তারপরে। এ মতের স্বপক্ষে গবেষকদের দাবি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নারীবেশে অভিনয়ের মধ্যেই যাত্রার আদর্শ নাট্যিক প্রয়াস প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

আমার মতেও নাটক অর্থে যাত্রার উদ্ভব দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং যাত্রার অন্তবীজ বপণ করা হয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে। কারণ হিসেবে আমি বলতে চাই যে, বাংলা ভাষা যেমন শুরুতে আজকের মতো ছিল না কালের বিবর্তনের মধ্যদিয়ে নানা রূপ পরিগ্রহণ করে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। নাটকের ব্যাপারটিও আমাদের ভাষার বিবর্তন কিংবা মানব সভ্যতার বিকাশের নানা পর্যায়ের মতোই একটি গতিময় প্রক্রিয়া। চর্যাপদের যে ভাষা তা আজকের বাংলা ভাষা থেকে সম্পুর্ণভাবেই আলাদা মনে হয়। আজকের বাংলা ভাষা ভিন্ন বলেই আমরা বলতে পারি না যে, চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয়। বাঙালি গবেষক মাত্রই বিশ্বাস করে যে, চর্যাপদ থেকে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আধুনিক রূপ লাভ করেছে। এমত কেবল ভাষার ক্ষেত্রে না; সাহিত্যের সকল শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষ করে লোকনাট্য যাত্রার ক্ষেত্রে তো বটেই। বাঙালির নাটক মাত্রই প্রাচীনকালে মূলত গেয় এবং কাব্যাকারে রচিত হোত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য হলেও তার সর্বাঙ্গজুড়ে রয়েছে নাটকের উপাদান। যেহেতু যাত্রা বাংলাদেশের প্রাচীন লোকনাট্যের আঙ্গিক তাই গীতগোবিন্দের মধ্যে যাত্রার উপাদান দেখার প্রয়াস নিছক কল্পনা নয়। বরং বাঙালির অভিনয়কলা হঠাৎ একবারে আধুনিকভাবে সৃষ্টি হবে এমনটাই অলীক কল্পনা। তাই আমি মনে করি দ্বাদশ শতাব্দীতে যাত্রানাট্যের উদ্ভব হয়েছে। তবে আধুনিক নাট্যকলা হিসেবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে আঠার শতকে।

যাত্রার বিকাশ: লোকনাট্য হিসেবে যাত্রাপলার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। যাত্রাপালা অতি প্রাচীন কাল থেকে ধর্মভাবকে তার অঙ্গাভরণ করে দেব উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীত ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সহস্রাধিক বছর ধরে জনশিক্ষার জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে বঙ্গবাসীর মনে যে পদ্মাসন করে নিয়েছিল একথা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যাত্রাপালার গৌরবোজ্জ্বল জয়গাণের সঙ্গে যারা তৎকালে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের নামের একটি ফিরিস্তি দিলেই যাত্রাপালার বিকাশের ধারাটি সহজেই আবিষ্কার করা সহজ হয়ে যাবে। বিশেষ করে গীতগোবিন্দ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহজিয়া মত প্রচারসহ মধ্য যুগে যাত্রাপালা নৃত্যগীতের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে গ্রামীণ জনগনের নীতি শিক্ষা ও নাট্য বিনোদনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। আর এ কারণে শিশুরাম [৩৭] অধিকারী থেকে শুরু করে শ্রীদাম-সুবল, পরমানন্দ অধিকারী

Dhaka University Institutional Repository

(১৭৩৩-১৮২৩), লোচন অধিকারী, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী (১২০৫-১২৭৭), পীম্বর অধিকারী, কাল চাঁদ পাল, কৃষ্ণকমল গোস্বামী (৯১৮১০-১৮৮৮), মদন মাস্টারের দল, রসিকলাল চক্রবর্তী, (১২২৭-১৩০০), প্রেমচাঁদ অধিকারি, দুর্গচরণ ঘড়িয়াল, লোকনাথ ধোপা, বোকোর দল প্রমুখ অধিকারীদের যাত্রাগান কালের বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে দেবালয়ের আসর কেদ্রিক গায়েন-দোহার ও নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশিত গায়কী ঢং থেকে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমান্বয়ে তাঁর একটি সংলাপযুক্ত [৩৮] আধুনিক লৌকিক নাট্যরূপ পরিগ্রহ করে বর্তমান কালের কালজয়ী লোকনাট্য যাত্রাপালার পরিণত রূপ লাভ করে। তবে যাত্রাপালা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে বিখ্যাত লোকনাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত ও অভিনিত হলেও তাঁর নাটকে যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্য অধিক পরিমানে লক্ষ করা গেছে। একারণে বোধয় আধুনিক কালের সাহিত্যিক ও নাট্য গবেষকেরা গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকারের মর্যাদা না দিয়ে তাঁকে যাত্রাওয়ালা বলে অভিহিত করেন।[৩৯] যারা বুঝে না বুঝে এধরনের তকমা গিরিশচদ্রের গায়ে লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আসলে ঠিকই করেছেন বলে আমার মনে হয়। কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটক আসলে গ্রামবাংলার জনপ্রিয় লোকনাটক যাত্রাপালারই প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক কালের নাটক, মঞ্চনাটক কিংবা ইংরেজ সৃষ্ট আধুনিক নাটকের সঙ্গে কোনভাবেই তাঁর নাটক কে মেলানো যায় না। বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্যকার হিসাবে এখানেই গিরিশচন্দ্র ঘোষের সার্থকতা। অর্থাৎ শিশুরাম অধিকারী থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ হয়ে মুকুন্দ দাশ চক্রোবর্তীর সময় কালে যে সকল স্বদেশি যাত্রাপালা বাংলার গ্রামীণ জনজীবনে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল, লোকনাট্য যাত্রাপালার সেই বিজয়গাঁথার সময়কালকে আমরা যাত্রাপালার বিকাশের ইতিহাস বলে অভিহিত করতে চাই।[৪০]

যাত্রার বিকাশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের কয়েকটি মতামত আলোচনার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করব। যাত্রাগবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'যাত্রাদলের গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে দুই ধরণের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন যাত্রানাট্যের উদ্ভব অতি প্রাচীন কালে হলেও নাট্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে যাত্রানাটকে অষ্টাদশ শতকে উদ্ভাবিত নাট্যাঙ্গিক হিসেবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

> একেবারে আদি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাত্রার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া কঠিন। অনেকে মনে করেন, কেঁদুলী গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ শিশুরাম অধিকারী যাত্রার নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর উত্তর সাধক রূপে শ্রীদামসুবল, পরমান্দ এবং আরও কয়েকজন যাত্রার পুনরুজ্জীবনে ব্রতী ছিলেন। অবশ্য শিশুরামের পূর্বেও যাত্রার দল ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শোনা যায় পরমানন্দ ছিলেণ প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর গুরু। [৪১]

যাত্রানাট্যের বিকাশ সম্পর্কে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর মত নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা যাত্রাগানের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু পরিহার করে এবং সামাজিক বিষয় অবলম্বন করে যাত্রার আখ্যানভাগ গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ করা গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে অশিক্ষিত বিকৃত রুচির পঙ্কিলতাই প্রাধান্য পেল। স্থূল কৌতুক ও অশালীন রঙ্গরস যাত্রার মঞ্চকে আবিল করে তুলল। [৪২]

যাত্রার বিকাশ সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে মত দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যাত্রার বিকাশ কয়েক শতাব্দীর ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে যাত্রানাট্য উনবিংশ শতাব্দীতে এসে একটি সত্যিকারের নাট্যরূপ লাভ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করেছেন।

> যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু, তাহার নৃত্য-গীত-প্রাধ্যান্য, তাহার চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং স্থুলতা, থাকিয়া থাকিয়া পাগল-পাগলিনী বিবেক, নিয়তি, প্রভৃতির আকর্ষিক আবির্ভাব ও তিরোভাব, স্থানে অস্থানে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন ভাবে বিবিধ প্রথায় হাস্যরসের আয়োজন ইহার সকলের সহিতই নাট্য-পিপাসু বৃহত্তর জনমনের একটা নিগুঢ় যোগ রহিয়াছে; এক কথায় বলতে গেলে, যাত্রা এবং অনুরূপ গীতাভিনয়ে ভিতর দিয়া আমাদের বাঙালী-মনোধর্মেরই একটা পরিচয় দেখিতে পাই। [৪৩]

যাত্রা গবেষক তপন বাগচী তাঁর গবেষণায় যাত্রার ক্রমবিকাশ অধ্যায়ে যাত্রানাট্যের বিকাশ সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মূলতঃ চেতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে যাত্রার বিবর্তন ও বিকাশের বিষয়টি মাথায় রেখে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

> যাত্রাগানের বিকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে। যাত্রার উৎপত্তি হয়েছে থিয়েটার তথা নাটকের আগে, যাত্রার বিকাশও তেমনি নাটকের আগে শুরু হয়েছে। তাই নাটকের আলোচনা করতে গেলে যাত্রার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা এই যে, আমাদের দেশে নাটককেন্দ্রিক আলোচনায় যাত্রার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। [৪৪]

সুরেশচন্দ্র মৈত্র যাত্রানাট্যের বিবতর্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন-

> যাত্রা কলকাতায় এসে তার ভক্তিরস ফিকা করে নিল রঙ্গরসের মিশ্রণে। এবং বহু স্থলে ভক্তিরস আদি রসের কবলে পড়ে এক বিকৃত প্রমোদকলায় পরিণত হল। কৃষ্ণ-কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিষয় কেবল গুরুত্ব অর্জন করল। [৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাট্য যাত্রার বিকাশে কৃষ্ণকমল (১৮১০-১৮৮৮) গোস্বামীর রচিত পালাসমূহ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এ কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তাঁর 'নিমাই সন্ন্যাস', 'স্বপ্ন বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্রবিলাস', 'সুবল সংবাদ', 'নন্দ বিদায়' প্রভৃতি পালা গদ্য সংলাপের সাথে গানের সংমিশ্রণ যাত্রানাট্যের ক্রমবিকাশের ধারায় অভিনবত্বের দাবি রাখে। গবেষকের মতে-

> তাঁহার যাত্রাপালায় গদ্য সংলাপ অপেক্ষা গীতিসংলাপ অধিক প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার অনেক যাত্রাপালা চৈতন্য জীবনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।[৪৬] যাত্রার বিকাশে মদন মাস্টারের(১২২৯-১২৬৫) দলের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য বলে গবেষকগণ মত দিয়েছেন। যাত্রার সংস্কার করার জন্য তিনিও তাঁর দল বিশেষ অবদান রেখেছেন বলে স্বীকৃত আছে। তিনি নিজে পালাকার ছিলেন। দক্ষযজ্ঞ, হরিশচন্দ্র, রাম বনবাস, ধ্রুবচরিত্র, দুর্গামঙ্গল, সীতা অন্বেষণ, প্রভৃতি যাত্রাপালা যাত্রানাট্যের বিকাশের ইতিহাসকে তরান্বিত করেছিল। [৪৭]

বিংশ শতব্দীকে অনেক গবেষক যাত্রানাট্যের বিকাশের স্বর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এ সময় স্বদেশী আন্দোনের গতিকে বেগবান করার জন্য মুকুন্দ দাসের যাত্রা বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি যাত্রায় দেশপ্রেমের বিষয়টি যুক্ত হওয়ার কারণে এ শিল্পটি বিশেষ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। গবেষকের মতে-

> তাঁহার স্বদেশী যাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাতে উদ্দীপনাময় গানের সঙ্গে মুকুন্দদাস আবেগ ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া জনগণের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতেন। মাথায় পাগড়ী ও গৈরিক ভূষণধারী মুকুন্দদাশ প্রত্যেক পালায় একটি গায়ক চরিত্রে অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বক্তৃতা। [৪৮]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর থেকে যাত্রাপালা তার ধর্মীয় আবরণ ত্যাগ করে সমাজ জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বিশেষ করে সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয়গুলো যাত্রাপালায় বেশি প্রাধান্য পাই। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সাথে সাথে যাত্রানাট্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের মাধ্যমে এর বিকাশের ধারা চোখে পড়ার মতো।

সিদ্ধান্তঃ পরিশেষে একথা বলতে চাই যে, বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নাট্য চর্চার ধারায় লোকনাট্য যাত্রাপালার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও বেশি প্রাচীন। এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপ একথা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি মানুষের জন্মগত ও জৈবিক চর্চার ফল। আর সাহিত্য হল উর্বর মস্তিকের যুক্তি নির্ভর সৃষ্টি। এ কারণেই অনেক বিদগ্ধ গবেষকের গবেষণায় লোকনাট্য যাত্রার আলোচনায় তথ্যগত প্রমাণের চেয়ে স্মৃতি নির্ভর কাহিনীর প্রধান্য বেশি লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জি,

১. দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৭

২. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫

৩. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ ভাগ*, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮ পৃ. ৬৯৭

৪. Nishikanta Chattapadhya, *The Yatras or The Popular Drmas of Bengal,* London: Trubnar & Co., 1882, p. 2.

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৬. অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, *যাত্রা: সেকালে একালের বিশ্লেষণাত্মক বিবেচনা*, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২) পৃ. ৩৪০

৭. সনৎ কুমার মিত্র, *যাত্রা: থিয়েট্রিক্যাল অপেরা* (প্রবন্ধ) সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৮৩ পৃ. ২১৬

৮. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ ৯৪।

৯. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতহিাস*, ১ম খণ্ড, আনন্দবাজার পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১,পৃ. ৩৪

১০. অশীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃ. ৩৩৬

১১. প্রাগুক্ত, ১৯৯৬ পৃ. ৩৩৭

১২. ড.আশরাফ সিদ্দিকী, (১৯৯২-৯৩) *যাত্রা*, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২), পৃ. ২৮৩।

১৩. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *যাত্রা*, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২), পৃ. ৫৯।

১৪. ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, (*বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ, ৫৩

১৫. আশুতোশ ভট্টাচার্য, *যাত্রা*, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২), পৃ. ৯৩।

১৬. ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২), পৃ. ১৬৩।

১৭. ড. সুভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *লোকাভিনয়ের ধারা*, (সম্পাদক: সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২)। পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪*, (ঢাকঃ মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩২৬)।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

২১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ ঃ ঃ কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃ. ২০২।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২৪. আসকার ইবনে শাইখ, *যাত্রা ও নাটক*, (সম্পাদকঃ সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২)। পৃ. ১০৫।

২৫. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, বর্ণমিছিল প্রাকাশনী, ১৯৭৮, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

২৬. সুকুমার সেন, *বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড*, আনন্দবাজার পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯১৯১. পৃ. ৩৪।

২৭. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটকঃ বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল,২০০৮ পৃ. ১৪৯।

২৮. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগানঃ জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন, ২০০৭ পৃ. ২৬।

২৯. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, সাহিত্যলোক*, কলকাতা, ১৯৯৮. পৃ. ২।

৩০. অমূল্যচরণ, বিদ্যাভূষণ *'যাত্রা' লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, কলকাতা।

৩১. হংসনারায়ণ ভট্টাচায, *যাত্রাঃ কৃষ্ণকোমল গোস্বামী*, সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) বিশেষ সংখ্যা ৭বর্ষ, ২য় সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা, পৃ. ১৭৮।

৩২. জসীম উদ্‌দীন, *আমাদের লোকনাট্য ও রূপবান যাত্রা*, (সম্পাদকঃ সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, *বাংলা একাডেমি, ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২), পৃ. ৬৯।

৩৩. কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের লোকনাট্য ঐতিহ্য*, ন্যশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬৫।

৩৪. অহীন্দ্র চৌধুরী, *'যাত্রা' বাঙালীর নাট্যচর্চা*, শংকর প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২। উদ্ধৃতি, মার্জিয়া আক্তার, পৃ. ৭৭।

৩৫. প্রভাতকুমার গোস্বামী, ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক যাত্রা, উদ্ধৃতি, মার্জিয়া আক্তার, পৃ. ৩৯।

৩৬. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭.ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৩৮.প্রাগুক্ত, ২৩৫।

৩৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

৪০.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

৪১.বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *যাত্রাদলের গোড়ার কথা*, (সম্পাদকঃ সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২) পৃ. ১৩৭।

৪২.কবির চৌধুরীর, *প্রসঙ্গ যাত্রা*, প্রথম জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা, ঢাকা, ১৯৭৯।

৪৩.শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

৪৪.তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন,২০০৭, পৃ. ২৯-৩০।

৪৫.সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

৪৬.ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৪৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৪৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ঐতিহাসিক নাট্যধারার ইতিহাস অন্বেষণ করলে আমরা দেখতে পাই লোকনাট্য যাত্রাপালার ইতিহাস বাঙালির ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য নিদশর্ন, শিলালিপি, ধর্মীয় গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনী, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গ্রন্থে উল্লিখিত বাঙালির নাট্য প্রসঙ্গকে বিবেচনায় নিয়ে লোকনাট্য যাত্রাপালার ইতিহাস অন্বেষণ করা সম্ভব। এ অধ্যায়ে যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় দুটি দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করব। একটি বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারায় যাত্রাপালার অবস্থানের ইতিহাস এবং বাংলা ভাষা-ভাষি ভূখণ্ডে অভিনীত যাত্রাপালায় বিষয়বস্তু হিসেবে ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র কীভাবে ভূমিকা রেখেছে তার গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা।

একথা সর্বজনবিদিত যে, নাট্য ইতিহাসের উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে নানারকম ধর্মীয় উৎসব ও ধর্ম। গ্রীক নাটকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের দেশের যাত্রানাট্যের ক্ষেত্রে এটি এখনও প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন মিটিয়েও যাত্রাপালা একসময় নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা যাত্রার আদি ভিত্তি সৌর উৎসবকে কেন্দ্র করে, এ ধরনের একটি মত প্রচলিত আছে।[১] এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও যাত্রানাট্যের আভাষ পাওয়া যায়।

শুরুতেই আমরা ঋগ্বেদের[২] কথা উল্লেখ করতে পারি। এ গ্রন্থটি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে রচনা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৩] ঋগ্বেদের বিভিন্ন সুক্তে বঙ্গভূমিতে রচিত ও অভিনীত নাট্য ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। অথর্ব্য বেদের ব্রাত্য খণ্ডে এক ধরনের দিগ্বিজয় যাত্রার উল্লেখ আছে। গবেষকদের মতে, সম্রাট কল্পব্রাত্যের দিগ্বিজয় যাত্রায় তার সাথে একাধিক পার্শ্বচর থাকতো। পার্শ্বচরদের মধ্যে পুংশ্চলী ও মাগধের ভূমিকার কথা জানা যায়। ঋগ্বেদের বর্ণনায় সম্রাটকল্পব্রাত্যের দিগ্বিজয় যাত্রার সঙ্গে মৌর্য রাজাদের বিহার যাত্রার মিল পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য রাজপুরুষেরা উচ্চ ধ্বনিতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিহার যাত্রা করতো বলে গবেষকেরা মত প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে রাজ্য পরিভ্রমণের নিমিত্তে প্রত্যেক বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রাজধানী থেকে বের হয়ে বিহার যাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করতেন।[৪] এসময় রাজারা রথ, রথের ঘোড়া, রান্না-বান্নার জন্য পাচক, মালবাহী পশু, মালবাহী পশুর জন্য চালক ও খাদ্য দানকারী; সেসব ছাড়াও থাকতো মনোরঞ্জনকারী নৃত্যগীত পটিয়সী নারী-পুরুষ, নট-নটী। এই বিহার যাত্রার পর সম্রাট অশোকের সময় ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করলেও তার মধ্যে নৃত্য-গীতের ধারা বজায় ছিল বলে জানা যায়।[৫] বর্তমান কালের যাত্রাপালাতেও বিষয়টি অক্ষুন্ন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, বর্তমান যাত্রানাট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাচীনকালের বিভিন্ন ক্রিয়াদির মধ্যে রয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যেও লোকনাট্য যাত্রার অভিনয় ইঙ্গিত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৭ নম্বর চর্যাপদের মধ্যে যে নাটকের কথা বলা আছে তা মূলত যাত্রানাট্যের প্রাথমিক রূপের ইঙ্গিত বহন করে বলে মনে হয়। এ চর্যায় একটি বিষয় বেশ পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বুদ্ধ নাটক বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে নারীর চরিত্রে পুরুষ অভিনয় করছে বলেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের যাত্রানাট্যেও আজ পর্যন্ত নারীর চরিত্রে পুরুষকে অভিনয় করতে দেখা যায়। আর ঠিক এ কারণেই আমরা মনে করি যাত্রানাট্যের সঙ্গে চর্যাপদের একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে। যেমন-

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী

বুদ্ধ নাটক বিসমা ভই।।[৬]

উপরিউক্ত পদে দেখা যায় পুরুষ নৃত্য করছে, আর নারী বসে গান গাইছে। উক্ত পদে যে নাটকের কথা বলা হচ্ছে তা মূলত বর্তমান কালের যাত্রানাট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কারণ হিসেবে আমরা একথা বলতে চাই যে, চর্যাপদ যারা রচনা করেছিলেন তাঁরা মূলত প্রাচীন বাংলার লোককবি। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিলনা বলেই অনেক গবেষক প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি চর্যাপদের ভনিতায় কবিদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে কোনোভাবেই তাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত পরিবারের মানুষ বলে মনে করা যায় না। গবেষকদের মতে তারা ছিলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্ত্যজ শ্রেণির কবি ও সাধক। তাঁদের কবিতায় যে সমাজচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় তা মূলত সাধারণ জনজীবনের নৈমিত্তিক চিত্র। কোনো কোনো গবেষক এ পদগুলোকে প্রাচীনতম নাট্যাঙ্গিক বলেই মনে করেছেন।[৭] আমি মনে করি প্রাচীন চর্যাপদের লৌকিক ধারার ইঙ্গিত পরবর্তী কালের যাত্রাপালার পালাকারেরা গ্রহণ করেছেন। একটু গভীরভাবে ভাবলে আমরা দেখতে পাব যে নৃত্য-গীত চর্যাপদের একটি বিশিষ্ট অনুসঙ্গ। বর্তমান কালের যাত্রানাট্যের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নৃত্য-গীত। কোনো কোনো গবেষক চর্যাপদগুলোকে নৃত্যগীত পরিবেষণার পাণ্ডুলিপি বলে মনে করেন। এ বিষয়টির কথা বিবেচনায় নিয়েও বলা যায় চর্যাপদের নৃত্য-গীতের মধ্যে যাত্রানাট্যের ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান করা একেবারে অমূলক হবে না।

চর্যাপদগুলোর মধ্যে বিধৃত জীবনচিত্র ও সমাজ বাস্তবতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা একান্তভাবেই লৌকিক জীবন থেকে উৎসারিত। সে জীবন সমাজের উচ্চবিত্ত জীবনাচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চর্যাপদের সমসাময়িক সময়ে যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বসবাস করত তাদের মধ্যে এক ধরনের লোকনাট্যের প্রচলন ছিল এমন বিবরণ স্বয়ং চর্যাপদের মধ্যেই রয়েছে। চর্যাপদের মধ্যে প্রাচীন বুদ্ধ নাটকের বিবরণও পাওয়া যায়। বুদ্ধ নাটকে ব্যবহৃত সাজ-সজ্জার কথাও একটি চর্যায় উল্লেখ রয়েছে। চর্যাগীতিকার ১০ সংখক পদে নৃত্যগীতের জন্য আলাদা সাজপোশাকের বিবরণ ও পাওয়া যায়। যেমন-

একসো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী ।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসিসি জাসি ডোম্বী কাহেরি নাবে।।
তান্তি বিকণহ ডোম্বী আবরমো চাঙ্গিড়া।
তোতোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া।।[৮]

উল্লিখিত পদে নটপেটিকা দ্বারা নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য পরিহিত আলাদা সাজ-পোশাক ও তা সংরক্ষণের বাক্সকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান কালের নাট্যধারার মধ্যে একমাত্র পেশাদার যাত্রা অভিনেতাদের সাজ–পোশাক রাখার জন্য প্রত্যেক অভিনেতার আলাদা আলাদা বাক্সপেট্রা থাকে।

আধুনিক কালের প্রখ্যাত নাট্য গবেষক ড. সেলিম আল দীন চর্যাপদের নৃত্যগীতকে গীতাভিনয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথা মনে করেন যে, চর্যাপদের মধ্যেই প্রাচীন লোকনাট্যের আঙ্গিক লুকাইত আছে। এছাড়াও তিনি চর্যাপদে উল্লিখিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে পেশাদারিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন-

> ১০ সংখ্যক চর্যায় নড়পেড়া শব্দের অর্থ যদি নটপেটিকা হয় তবে দেখা যায় যে, সে কালে ছোট পেটিকা বা পেটরায় নটনটীর সকল সাজপোশাক রক্ষণাবেক্ষণ পেশাজীবীদের পক্ষেই সঙ্গত। উল্লিখিত চর্যায় বিভিন্ন নৌকায় ডোমনীর আসা-যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে... এ থেকে দেখা যায় সে কালে নিম্নবর্ণের নারীপুরুষেরা নৃত্যগীতাভিনয় প্রদর্শনের জন্য নানা স্থানে আসা যাওয়া করতো।[৯]

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যে আমরা যে, নৃত্যগীতাভিনয়ের পরিচয় পাই তা মধ্যে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রার ঐতিহাসিক উৎসমূল থাকতে পারে বলে মনে করি। অভিনেতা অভিনেত্রীদের শ্রেণিচরিত্রের ব্যাপারটা বিবেচনায় নিলে যাত্রানাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে চর্যাপদের অভিনেত্রীদের মিল পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাই আমি মনে করি চর্যাপদের অভিনয় অনুষঙ্গ মাথায় রেখেই লোকনাট্য যাত্রার ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত।

চর্যাপদের পর ১২ শতকে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যকে অনেক গবেষক নাটগীত বলে উল্লেখ করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদি নাটগীত হয় তাহলে আমরা গীতগোবিন্দের মধ্যেও যাত্রানাট্যের প্রাথমিক রূপ আছে বলে ধরে নিতে পারি। প্রখ্যাত নাট্য ইতিহাস প্রণেতা আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের মধ্যে যাত্রার প্রাথমিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থ দুটি লোকনাট্য যাত্রার আদি উৎস হতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

> জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীত শ্রেণির রচনা। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হত বলে ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে কেবল মাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তবু শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়; কারণ, তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ করে তাকে 'নতুন যাত্রা' বলে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 'নতুন যাত্রা' কথাটি থেকেই পুরাতন যাত্রা কথাটি সম্ভবত এসে পড়ে; মনে হয় মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোত বলে তাকে সাধারণভাবে যাত্রা বলা হোত।[১০]

তাঁর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে তিনি প্রাচীনকাল হতে যাত্রানাট্যের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি এমনটিও মনে করেছেন যে, সংস্কৃত নাট্যের পাশাপাশি সেকালে যাত্রানাট্যের প্রচলন ছিল। তিনি বলেছেন-

> প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে এ বিষয়ে দুইটি ধারাই প্রচলিত– একটি সংস্কৃত নাটকের ধারা, আর একটি দেশীয় যাত্রার ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী যখন ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিল, তখন নিজের দেশের বিশিষ্ট এই দুইটি নাট্যধারার প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বিশেষত দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম যুগে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক দুই-ই সমানভাবে বাংলায় অনূদিত হইতে থাকে এবং সেই যুগের বাংলা নাটকের আঙ্গিকের দিক দিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক উভয়ই সমান প্রভাব বিস্তার করে।[১১]

ড. সেলিম আল দীন তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে বাংলা লোকনাটকের মধ্যযুগীয় রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রানুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি গীতগোবিন্দকে নাটগীত পালা বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন-

> প্রাচীন বাংলার নাট্যরীতির প্রামাণ্য হিসেবে লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব-১২ শতক- 'গীতগোবিন্দে'র নাম উল্লেখ করা যায়। চব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত বয়ম শব্দটির নির্ণয় হয়েছে নাটগীতের গায়ক বাদক দল। অর্থাৎ জয়দেবের কাব্য মধ্যেই এর পরিবেষণারীতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোকে যে অর্থ নির্ণীত হয়েছে তা থেকে এ পালায় নৃত্য ও অভিনয়ে শুধু পদ্মাবতীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়। কবি জয়দেব নিজেকে পদ্মাবতী চরণ-চারণ চক্রবর্তী রূপে উল্লেখ করেছেন। এখনো চরণ-চারণ অর্থ দলের অধিকারী।[১২]

বর্তমান কালেও অধিকারী শব্দটি কেবলমাত্র লোকনাট্য যাত্রাদলের মালিক বা ম্যানেজারকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। আমরা একথা জানি যে, অদ্যাবধি যাত্রাপালার নিয়ন্ত্রককে অধিকারী বলা হয়। তাই ঐতিহাসিক বিবেচনায় গীতগোবিন্দের সঙ্গে যাত্রার যোগসূত্রের বিষয়টি পরীক্ষিত সত্য।

লোকনাট্য যাত্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য আলোচনা করলে খুব সহজেই সাহিত্যের ইতিহাসে যাত্রানাট্যের অবস্থান অনুমান করা যাবে। শুধু তাই নয় তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যেও লোকনাট্য যাত্রাপালার সমরূপ দেখতে পেয়েছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন–

> গীতগোবিন্দের যে সকল সুরতালের নির্দেশ রহিয়াছে তাহাদের সহিত নৃত্যের সহজ যোগ আছে। বিষয়বস্তুটি যেমন বর্ণনার ভিতর দিয়াও ফুটিয়াছে, তেমনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্ণযাত্রা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আমরা কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাই। সেখানে কৃষ্ণের কংসবধ এবং বিষ্ণুর বালিকে পাতালে বদ্ধ করিবার উপাখ্যানের উল্লেখ পাই। এই অভিনয় কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; কেবল মুকাভিনয় ছিল, কেহ বলেন বিভিন্ন চরিত্রের অংশ লইয়া ইহা নাট্যাভিনয়েরই একটি স্থূল রূপ ছিল। আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে এই কৃষ্ণযাত্রারই একটা পরিণতি দেখতে পাই।[১৩]

গীতগোবিন্দের পর মধ্য যুগের অন্যতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়ে লক্ষ করে দেখি। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যেও শশিভূষণ দাশগুপ্ত যাত্রাপালার ঐতিহাসিক নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তিনি যাত্রানাট্য হিসেবে মূল্যায়ণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেষণা রীতির মধ্যে তিনি লোকনাট্য যাত্রাপালার অভিনয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন বলেও মত দিয়েছেন। কাজেই যাত্রাপালার ঐতিহাসিক সূত্রানুসন্ধানে তাঁর দ্বিতীয় অভিমতটি তুলে ধরা হল। তিনি লিখেছেন:

> জয়দেবের পরে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিতরে পাওয়া যায় সেই কৃষ্ণযাত্রারই পরিণতি। এখানে কৃষ্ণযাত্রাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে; প্রত্যেকটি 'খণ্ড' স্বয়ংসম্পূর্ণ পরবর্তী কালের নাট্যাভিনয়ের ভাষায় প্রত্যেকটি খণ্ডকে বলা যাইতে পরে এক একটি পালা। প্রত্যেক খণ্ডের প্রত্যেকটি পদই সুরতালাদির সহিত গেয়। কৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই, এখানে যে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কতগুলি আখ্যানই রহিয়াছে তাহা নহে; এই আখ্যানের ভিতরে কবির বর্ণনা অপেক্ষা বর্ণিত চরিত্রগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তি ভিতর দিয়াই ঘটনাটি আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে অধিক। নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা এবং মধ্যবর্তিনী বড়াই বুড়ীর সংলাপ বিষয়বস্তুকে অগ্রগতি দান করেছে। স্থানে স্থানে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি স্পষ্টভাবেই নাট্যধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।[১৪]

চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত লোকনাট্য যাত্রার আদি যুগের পরিধি। এসময় যাত্রার স্বতন্ত্র কোনো রূপ পাওয়া দুষ্কর, তবে বিভিন্ন সাহিত্য উপকরণের মধ্যে যে নাট্যগুণ পরিলক্ষিত হয় তাকে লোকনাট্য যাত্রার উৎসমূল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের মতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলা নাটকের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। এমন মত অনেক গবেষক প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনও বলেছেন যে, গদ্য আবিষ্কারের পূর্বে পূর্ব বাংলায় কোনো দৃশ্যকাব্য প্রত্যক্ষ করা যায় নি। অথচ প্রাচীন কাল হতে বঙ্গভূমিতে যাত্রাভিনয়ের কথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। মজার ব্যাপার এই যে, তৎকালীন অনেক গবেষক যাত্রানাট্যকে নাটক বলেই স্বীকার করেন নি।[১৫] কাজেই যাত্রানাট্য বাঙালির প্রাচীন লোকনাট্যের আঙ্গিক এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার।

লোকনাট্য যাত্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য দেবের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই যাত্রানাট্যের ইতিহাসে তাঁর অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। অভিনয়কলা হিসেবে যাত্রা মূলত চৈতন্যদেবের মাধ্যমেই নাট্যিক রূপ লাভ করে বলে বহু গবেষক এ বিষয়ে মত দিয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের কারণেই যাত্রা মন্দির প্রাঙ্গন থেকে আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে। চেতন্যদেবের পরশেই যাত্রা বিশেষ কোন ধর্মের বন্ধনে না থেকে মানবতাবাদ প্রচারের জনমাধ্যমে পরিণত হয়। তিনি যাত্রাভিনয়কে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বলেই হয়তো যাত্রা এতো দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট্য যাত্রাপালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দের মতে-

> চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে শ্রীগৌরাঙ্গ যেদিন অদ্বৈত শ্রীরারাম নিত্যানন্দ প্রভৃতি পারিষদদের নিয়ে 'রুক্মিনীহরণ' পালাভিনয় করেছিলেন, যাত্রার ইতিহাসে সে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সহজতম সাধন পদ্ধতির প্রবক্তা শ্রীগৌরাঙ্গের মতো বাংলার মাটির বৈশিষ্ট্যকে কে এমনভাবে চিনে ছিলেন ? তিনি অনুভব করেছিলেন হাজার বক্তৃতা করে বাংলার মানুষকে যা বোঝানো যাবে না, একবার যাত্রাভিনয় করে তাই কানের ভিতরদিয়া মরমে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ পাদে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে ধন্য করে গিয়েছিলেন। তার সাড়ে চারশো বছর আগে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ যাত্রাশিল্পকে কৃতার্থ করে রেখেছেন। যতদূর জানা যায়, গোরাচাদের এই অভিনয়েই এদেশে সুসংবদ্ধ পালাভিনয়ের সূচনা।[১৬]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে. চৈতন্যদেবের যাত্রাভিনয় ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও প্রামাণ্য দলিল। তাই যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিবেচনায় চৈতন্য জীবনীগুলো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে যাত্রানাট্যে একাধিক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন নাট্যরস সৃষ্টি করে নাট্যিক কাঠামো ধারনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। এভাবে ষোল, সতেরো শতকের যাত্রা পালাকারে পরিবেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

আঠার শতক পর্যন্ত যাত্রাপালা তার গায়েন-দোহার সহযোগে আসর কেন্দ্রিক নাট্য চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখে। এ সময়ের যাত্রাকার হলেন শিশুরাম অধিকারী। তিনি বীরভূমের কেদেলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রচলিত কুরুচি প্রভাবিত যাত্রাকে ব্রক্ষণ শিশুরাম কিঞ্চিৎ পরিশোধন করিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশণ করতেন বলে জানা যায়। কবিগানের ন্যায় যাত্রাতেও অশ্লীলতা ভর করেছিল। শিশুরাম এই কুরুচি দূর করতে অনেকটাই সমর্থ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১৭] এরপর আঠার শতকের যাত্রার প্রাণ পুরুষ বলা হয়ে থাকে শ্রীদামদাস ও সুবল দুই সহোদরকে, তারা কালীয়দমন যাত্রা করত। এই দুই অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণযাত্রার প্রথমে গৌরচন্দ্রী পাঠের পরে কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে গোসাইর শুভাগমন হত। ভ্রাতৃদ্বয় যাত্রায় এই রীতি অনুসরণ করতেন বলে জানা গেছে।[১৮] তাদের পদাঙ্কানুসরণ করে পুরো আঠার শতক জুড়ে অনেক স্বনামধন্য যাত্রাপালাকারের যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যাত্রানাট্যের উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচনার শুরুতেই আমরা তৎকালীন ঐতিহাসিকদের কিছু মতামত পর্যালোচনার মাধ্যমে ঐসময়ে যাত্রার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনে নেব। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহে নাটক সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [১৯] বাংলা নাটক ও নাট্যকারদের নিয়ে খুব সামান্যই লিখেছেন। তাদের আলোচনায় বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

কোন মন্তব্য করেন নি। বাংলা নাটকের কথা বললেও নাটকের কোন ইতিহাস আছে বলে তাঁদের লেখায় এমন কোন আভাষও পাওয় যায় নি।

ঊনিশ শতকের যাত্রার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রখ্যাত নাট্য গবেষক ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্রের একটি অভিমত আলোচনা করলেই যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যাবে। তিনি বলেন-

> ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় ঢাকা কলেজ ভবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "বঙ্গভাষায় পূর্বে কোন দৃশ্যকাব্য হয় নাই। বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া আসিতেছে বটে কিন্তু সেসকল যাত্রা কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে এবং তত্ত্ববত নাটকের নিয়মে অভিনীত নহে।" যাত্রা ও নাটকের মধ্যে কোন সম্পর্ক সরকার মহাশয় স্বীকার করতে চান না এবং এগুলির কোন লিখিত আকার ছিল তাও তিনি অস্বীকার করেন।[২০]

গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের মতানুযায়ী বাংলা নাটক হল ইংরেজ পরবর্তী একটি নতুন প্রমোদকলা। সরকার মহাশয়ের মতকে আমরা যদি সত্য হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে বঙ্গভূমিতে ঊনিশ শতকের পূর্বের নাটকের ইতিহাস মানে যাত্রানাট্যের ইতহাস। সরকার মহাশয়ের মতকে গ্রহণ করার পক্ষে আমার যুক্তি এই যে, সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস বাদ দিলে প্রাচীনকাল থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত নাটকের ইতিহাস মানেই যাত্রানাট্যের ইতিহাস।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে সাহিত্যের ইতিহাসে যাত্রানাট্যের বিশেষ গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এক বিশেষ যুগে কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাদের হাতে বাংলাভাষার পরিপুষ্টি ঘটেছিল।'[২১] শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এ বিশেষ যুগ বলতে আমরা ১৬ শতক থেকে ১৮ শতকের পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত সময়কে ধরে নিতে পারি। কারণ সাহিত্যের ইতহাসে যাত্রাপালার ও পালাকারদের কথা অনুল্লেখ থাকলেও কবিগান ও কবিওয়ালাদের কথা উল্লেখ আছে। কাজেই ইংরেজ প্রবর্তিত নাটকের আগে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা মৌখিক রীতির যে নাট্যধারার চর্চা করতেন তা আমাদের যাত্রাপালা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধ সংগ্রহের নানা প্রবন্ধে নাটক সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তিনিও পূর্বকালের যাত্রাপালাকে নাটকের মর্যাদা দিতে নারাজ, তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য থেকে যাত্রার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ধারণা পাওয়া যায়।

তিনি বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্প্রদায় বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; এবং অভিনয়ের নির্মল রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই রস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয় প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়–ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দূস্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে – ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎছেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদূর্ভাব হয় – ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়; এবং তদর্থে আমরা দেশ হিতৈষীদিগকে একান্ত চিত্তে অনুরোধ করিতেছি। [২২]

ড. সুকুমার সেন প্রাক আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যাত্রানাট্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-

> বিলাতি স্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলতে এখন আমরা যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়, অমিলও আছে অনেকটা। বাংলা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। [২৩]

উপরি উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগে ইংরেজ প্রভাবিত আধুনিক নাটকের অস্তিত্ব না থাকলেও লোকনাট্য যাত্রার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যাত্রার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। তবে উনিশ শতকের সকল যাত্রানাট্যই ছিল গেয় এবং পালা আকারে, এ কারণেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ যাত্রাপালাকে নাটকের মর্যাদা দিতে রাজি হন নি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্মাশ্রিত ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এ বিষয়গুলো তৎকালীন যাত্রাপালায় লক্ষ করার মত। সমস্ত মধ্যযুগ জুড়ে যাত্রাপালায় একটি বিষয়ই বেশি লক্ষ করা গেছে তা হল বিভিন্ন নামে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তিতে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে মধ্যযুগীয় বেশিষ্ট্যের অবসান ঘটে এবং উনিশ শতকের শুরুতে ইংরেজ শাসনের অধীনে এক নব যুগের সূচনা হয়। ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এদশের যাবতীয় কাজ করেছে। কিন্তু তাদের অজ্ঞাতসারেই এদেশের মানুষের জীবনবোধের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সূচিত হতে থাকে। উনিশ শতকের শুরুতেই ইংরেজ সিবিলিয়নদের যে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তার মাধ্যমেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ইংরেজরা শাসন-শোষণের পাশাপাশি উনিশ শতকে এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি ও ধর্ম সংস্কারের ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২৪] এ সময় বাঙালি সমাজের মধ্যে যে নতুন চেতনা ও জাগরণ দেখা দেয়ার মূলে ছিল ইংরেজ প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের প্রয়োজনেই লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত হতে আগত সিবিলিয়নদের দেশীয় ভাষা ও আইন শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলার পর কলেজের ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ কেরি সাহেবের নেতৃত্বে রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সি, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার গোলকনাথ শর্মা প্রমূখ ব্যক্তিরা যে সকল বাংলা বই রচনা করেছিলেন তা থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়। [২৫]

রুশ নাগরিক গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১) কলকাতার ডোমতলায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] সেখোনেই বিদেশিদের হাতে প্রথম নাটকের যাত্রা শুরু হয়। লেবেদেফের নাটক করার কারণ হিসেবে ড. দর্শন চৌধুরী যে বিষয়টি ইঙ্গিৎ করেছেন, তা থেকে যাত্রানাট্যের ইতিহাসে এর আঙ্গিক পরিবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়।

পলাশী যুদ্ধের পর তখনও পঞ্চাশ বছর কাটে নি। কলকাতা তখনও শহর হয়ে ওঠে নি, হয়ে উঠছে এবং নতুন গঠিত শহরে বাঙালিরা ইংরেজদের ব্যবসার সঙ্গে মিশে অর্থোপার্জন শুরু করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর (১৭৯৩) বাংলার কৃষি নির্ভর জনজীবন বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে। কলকাতায় কাঁচা পয়সার লোভে বাঙালির ভিড় বেড়েই চলেছে। নতুন সৃষ্ট কলকাতার এই বাঙালি সমাজ রুচি, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পুষ্ট ছিল না। এদের যে ধরনের রুচি তারই তাগিদে কবিগানের আসর জাকিয়ে বসেছে। যাত্রাগানের কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক রস হারিয়ে নিম্নরুচির পর্যায়ে নেমে গেছে। নতুন 'বাবু' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে চলেছে।[২৭]

নাট্য চর্চার ইতিহাস আলোচনা অধ্যায়ে অনুপম হায়াৎ ঢাকায় মুসলিম আধিপত্যের অনেক আগে থেকে যাত্রার প্রচলন ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উনিশ শতকে পরিবর্তিত রূপে নতুন যাত্রা মঞ্চায়ন করা হত বলেও তাঁর গবেষণা কর্ম থেকে যানা যায়। তিনি বলেন-

> আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির আদি রূপ যাত্রা। ঢাকায় নওয়াব পরিবার আসার বহু আগে থেকেই ঢাকাই সংস্কৃতি ও বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল যাত্রা। খাজা পরিবারের অনেকেই ঢাকা এবং এর আশপাশে অনুষ্ঠিত যাত্রানুষ্ঠান হয়তো উপভোগ করে থাকবেন এটা খুবই স্বাভাবিক কথা। সীতার বনবাস, রামাভিষেক, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, এসব যাত্রাপালা উনিশ শতকে ঢাকায় মঞ্চস্থ হতো। যাত্রার ব্যাপারে নওয়াব পরিবারের জড়িত থাকার বিষয়টি গবেষণার বিষয়।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখায় গদ্যের ব্যবহার হতে থাকার কারণে এক দিকে যেমন মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয় তেমনি বাংলার শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে রুচি বিকৃতও দেখা দেয়।

যাত্রাপলার ইতহাসে উনিশ শতকের শখের যাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বরাহমনগর নিবাসী ঠাকুরদাস ১৮২২ খ্রি. একটি সখের যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অভিনীত হত। রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও নিমাই মিত্র দলের অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। এই দলের যাত্রায় প্রথমে নান্দীগান গীত হইত। গায়ক ছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য, কেবলারাম পাল নিমাই মিত্র। 'কেলুয়া'র ভূমিকায় তাঁরা ধোপার গান খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' পালাটি ঠাকুরদাস নুতনভাবে সাজাইয়া ছিলেন। ঠাকুরদাস চণ্ডীযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা পালা রচনা করেন। পালা দুইটি অভিনীত হয় মাকড়দহের (হাওড়া) বেণীবাধব পত্রের দলে। হাওড়া-কোণা নিবাসী গোপীনাথ দাসের দলে তার লেখা একখানি রামযাত্রার পালা অভিনীত হয়। ঠাকুরদাস সখের ও পেশাদারী দলের জন্য যাত্রা লিখতেন। উল্লিখিত পালা ছাড়াও তিনি 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নামে আরো দুটি লোকনাট্য রচনা করেন।[২৯]

যাত্রানাট্যের ইহিাসে বিংশ শতাব্দী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এসময় জনগণের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র চেতনা প্রবল ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ শতকের শুরু থেকেই যাত্রাপালায় সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় পৌরাণিক বিষয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিজীবন ও ইতিহাস কেন্দ্রীক বিষয় ও চেতনা প্রবলভাবে বিভিন্ন পালাকারের পালার মুখ্য বিষয় হিসেবে দেখা যায়। আমরা জানি যে উনিশ শতকের আশির দশক থেকেই যাত্রা আসর থেকে মঞ্চে উঠে আসে। পরে গেয় ঢং থেকে যাত্রা ক্রমেই সংলাপ নির্ভর হয়ে ওঠে। বিশ শতকের শুরুতেই যাত্রাপালা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি গীতবাহুল অন্য ধারাটি সংলাপ নির্ভর যাত্রা।[৩০] যাত্রায় সংলাপ আসার পর ক্রমান্বয়ে ঐতিহাসিক বিষয় ও ঘটনাবলি যাত্রার গুরুত্বকে ঐতিহাসিকভাবে পূর্ণাঙ্গ নাটকে রূপান্তর করতে সহায়তা করে।

বিশ শতকের প্রারম্ভেই যাত্রাপালায় ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে মঞ্চে গুরুত্বের সাথে স্থান করে নেয়। প্রখ্যাত লোকনাট্য গবেষক ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের বর্ণনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন–

> বিশ শতকের প্রথম হইতে রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৪), গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' (১০০৪), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপসিংহ, (১৯০০৫), প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষ সমাদর হইতে থাকে। ইহার প্রভাবে হরিহর চট্টোপাধ্যায় যাত্রায় ঐতিহাসিক নাট্যভিনয়ের প্রচলন করেন। পদ্মিনী তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক; 'পদ্মিনী' আসরস্থ হইবার পরে বিভিন্ন যাত্রার দলে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার পাশে ঐতিহাসিক পালাও অভিনীত হইতে আরম্ভ করে।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর থেকে যাত্রামঞ্চে একের পর এক ঐতিহাসিক পালা মঞ্চস্থ হতে থাকে। যেমন- 'মেবার কুমারী' (১৯২৩), 'আদিশূর' (১৯২৩) গণেশ অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক পালা।[৩২] 'বাঙালী, (১৯৪৮), আর্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরায় অভিনিত [৩৩] ,'সম্রাট জাহান্দার' (১৯৬১), নট কোম্পানী,[৩৪] 'বাংলার বিপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম' (১৯৪৯),[৩৫] 'দলমাদল' (১৯৪৯) রঞ্জন অপেরা,[৩৬] 'মুক্তির মন্ত্র' (১৯৫০),[৩৭] 'পলাশীর পরে' (১৯৪৭)[৩৮] রঞ্জন অপেরা. 'মাটিরপ্রেম'(১৪৮), সত্যম্বর অপেরা,[৩৯] 'বীরাঙ্গনা'(১৩৫৮), চণ্ডী অপেরা,[৪০] 'আগুন' (১৩৬০)[৪১] 'ধর্ম বিপ্লব'(১৩৬৩) [৪২] দ্বিতীয় পানিপথ'(১৩৭০), 'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৩৫৭)[৪৩], 'সম্রাট অশোক' (১৩৬৫),[৪৪] 'পৃথ্বীরাজ'(১৯৪৯)[৪৫] 'মসনদ'(১৩৭০),'মগেরদেশ'(১৩৭১)[৪৬] 'কবরের কান্না' (১৯৫৮)[৪৭] 'হিটলার'(১৯৬৯)[৪৮] 'লেনিন'(১৯৭০) [৪৯] 'আনারকলি' ইত্যাদি ছাড়াও অনেক যাত্রাপালা রচিত হয়েছে।

বাংলাশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য যাত্রাপালা। বাংলাদেশের প্রথম যাত্রা বিষয়ে পিএইচডি অর্জনকারী গবেষক তপন বাগচীর বর্ণনায়-

> মন্মথ রায়ের,'আমি মুজিবনই.(১৯৭১), 'উৎপল দত্তের, 'জয়বাংলা'(১৯৭১), 'নরেশচক্রবর্তীর, 'সংগ্রামী মুজিব'(১৯৭১), নিরাপদ মণ্ডলের 'মুক্তিফৌজ'(১১৯৭১), সত্যপ্রকাশদত্তের 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর'(১৯৭১), ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের' বঙ্গবন্ধুর ডাক'(১৯৭১), 'সাকোটির মুজিব' লেখকের নাম জানা যায় নি।, অরুণ রায়ের 'আমি মুজিব বলছি'(১৯৭২), ব্রজেন্দ্রকুমার-দের 'মুজিবের ডাক'(১৯৭২)' সাধন চক্রবর্তীর 'শেখ মুজিব'(১৯৭২), মৃণাল করের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'(১৯৭২), এপালাটি সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে ঢাকার মহানগর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয় বলে তপণ বাগচী জানিয়েছেন। পরিতোষ ব্রহ্মচারীর 'নদীর নাম মধুমতি'(১৯৭৪), বিপিন সরকারের 'মুক্তিসেনা'(১৯৭৪) [৫০] ।

সিদ্ধান্ত: উল্লিখিত পালাসমূহ ছাড়াও নানা ঐতিহাসিক বিষয় ও চরিত্র অবলম্বনে অসংখ্য যাত্রাপালা বাংলাদেশে রচিত ও অভিনীত হয়েছে যা নিঃসন্দেহে নাট্যসাত্যিের ইতিহাসে লোকনাট্য যাত্রাপালার ঐতিহাসিক গুরুত্বের দি দিয়ে স্বীকৃত। কাজেই এ কথা বলতে পারি যে, বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানতে হলে যাত্রাপালার ঐতিহিসিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। আর এটা করলেই বাঙালির নাট্যসাহিত্যের ইতহাস ১৮৭২ সালের ইংরেজ সৃষ্ট অর্বাচীন ইতিহাসকে বাতিল করে বাঙালির নাট্য ইতিহাস বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের সমসায়িক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশঃ

১. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৮,পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৬. মহামহোপাধ্যয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) *হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৫৮ পৃ, ৪৭।

৭. সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫।

৮. মহামহোপাধ্যয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

৯. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪*, (ঢাক: মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩২৭)।

১০.আশুতোষ ভট্টাচার্য, *যাত্রা*, (সম্পাদকঃ সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্পা, বাংলা একাডেমি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২)।

১১.আশুতোষ ভট্টাচর্য, বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

১২.সেলিম আলদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৩.শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট)লিঃ কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২, পৃ. ২০২।

১৪.শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০৩

১৫.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ রচনাবলী*, ১৯৫৬, পৃ. ১৮৩।

১৬.ব্রজেন্দ্রকুমার দে, (উদ্ধৃতি তপণ বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যমও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা' ২০০৭,পৃ, ২৯)

১৭.ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ২২১।

১৮.ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ২২১।

১৯.মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস*, ১৯২৮।

২০.সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২১. প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩।

২২. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিবিধ সংগ্রহ, উদ্ধৃতি, সুরেশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

২৪. অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২৮৮

২৫. মোহাম্মদ কাসেম, *বাংলাদেশ: জাতি ও সংস্কৃতি*, আষাঢ়, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২।

২৬. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,ফেব্রুয়ারি,২০০১, পৃ. ২৬।

২৭. ডক্টর দর্শণ চৌধুরী, *উনিশ শতকের নাট্যবিষয়*, কলকাতা,পৃ.২৫ (উদ্ধৃতি, অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬).

২৮. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২৯. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৩০. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৮।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫২।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬২।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭০।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭১।

৩৮. প্রাগুক্ত পৃ.৪৭৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৬।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৯।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৩।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৯।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৩।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭.প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৪।

৪৮.প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৫।

৪৯.প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৫।

৫০.তপন বাগচী, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯ টি যাত্রাপালা: একটি মূল্যায়ন, (https://sarabangla.net) মার্চ২৮, ২০১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালা

সামাজিক বির্তনের মধ্য দিয়ে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনের মাধ্যমে যুগোপোযোগী হয়ে যুগের প্রতিচ্ছবি ধারণ করাই কোনো ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়ের ধর্ম। এ বিষয়টি সমাজের সকল নিয়ামকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বিকাশ যেমন বিবর্তনের মাধ্যমে নানা স্তর অতিক্রম করে আধুনিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিবর্তনের বিষয় একই ভাবে লক্ষ করা যায়। মানবসমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিও যুগ সত্যকে ধারণ করে। সময়ের প্রয়োজনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের জন্য নানা স্তরে বিবর্তনের মাধ্যমে এক সময় সর্বজনগ্রাহ্য রূপে চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভ করে। বাঙালির প্রাচীন নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালাও সময়েরে প্রয়োজনে নানা স্তরে বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যাত্রাপালার বিবর্তনের ইতিহাসকে আমরা পাঁচটি যুগে বিভক্ত করে এ অধ্যায়ে মানবসমাজ বিকাশের নানা পর্যায়ে বিবর্তনের পটভূমিতে লোকনাট্য যাত্রাপালার রূপ-রূপান্তরের যৌক্তিক অবস্থান ধারাবাহিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করব।

যথা:

১. আদিকাল থেকে চর্যাপদ পর্যন্ত সময়কে প্রাগৈতিহাসিক যুগ
২. চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সময় পর্যন্ত হল প্রাচীন যুগ
৩. শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগ
৪. বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে আধুনিক যুগ এবং
৫. বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে যাত্রা নাট্যের অবক্ষয়ের যুগ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাত্রারূপ:

লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভবকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও যাত্রার বিবর্তন বা বিকাশের ব্যাপারে প্রায় সকল গবেষক একই রকম মত প্রকাশ করেছেন। প্রাচীনকালে সূর্য দেবতার কক্ষান্তরকে কেন্দ্র করে যে যাত্রার যাত্রা শুরু হয়েছিল তা সামাজিক বিকাশের ধারায় নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানের নাট্যাঙ্গিকে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে প্রায় সকল গবেষক ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে যাত্রা শব্দটি গমন বা শুভযাত্রাকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছিল; এ ব্যাপারেও অনেক নাট্য গবেষক একমত পোষণ করেছেন। বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ও নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহমদও এমন একটি মত দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যের মধ্যে যাত্রানাট্যের কালানুক্রমিক বিবর্তনের একটি চিত্র আমরা লক্ষ করেছি। তিনি বলেন:

> সেকালে তীর্থে গমন যাত্রার ধ্রুব লক্ষ ছিল। দেবতারা বড়ই সরল প্রকৃতিযুক্ত। দেবতাদের কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। দেবতাদের সাইকোলোজিক্যাল সমস্যা নাই। তাঁহারা বড়ই অনড় ও অব্যয়। তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট সংগীত ও পুজাপার্বন করিতে পারিলেই তাঁহারা তুষ্ট থাকিতেন। যাত্রাওয়ালারা সেকালে বড়ই সহজে দেব-তুষ্টিমূলক পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। জমিদাররা দেবতা হইয়া প্রথম গোল বাধাইল। যাত্রার মধ্যে পোকা প্রবেশ করিল। জমিদার সকল সুরা চাহিত এবং সাকীও দাবি করিত। জমিদার পুষ্প চাহিত এবং ফুল চাহিত। ফুলটি যে ভাড় তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এইমত করিতে বসিয়া যাত্রার সুরের মধ্যে অ-সুর প্রবেশ করিল। গানের স্থলে গদ্য আসিল। [১]

প্রখ্যাত ফোকলোর গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী যাত্রার ক্রমবিবর্তনের বিষয়ে প্রায় একই ধরনের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও খানিকটা পিছনের অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যাত্রার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাত্রার ক্রম বিবর্তন দেখিয়েছেন। তাঁর মতটি নিম্নরূপ–

> ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দমূল 'যা' ধাতু থেকে যাত্রা শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ গমন। এই যাত্রা কোন দেবপুরুষের গমন। যেমন, 'দেবযাত্রা' অর্থ কোনো দেবতার গমন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, প্রাচীন সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান গ্রহ-চন্দ্র-তারার এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে গমনের উপর নির্ভরশীল ছিল। গ্রহদের মধ্যে সূর্য এবং চন্দ্র যেহেতু বৃহত্তম, সেহেতু গমনের সঙ্গে সৌর ও চন্দ্র তিথিতে ফসল উৎপাদন উৎসব ও অনুষ্ঠান নির্ভরশীল ছিল। সূর্য যখন দক্ষিণায়ণে এসে যেত, আষাঢ়-শ্রাবণের দিকে, সাধারণ প্রাচীন লোকেরা ভাবত সূর্য বলে না দিলে, সে থেমে থাকবে– কাজেই শুরু হল প্রচীন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের চেরিয়েট ফেস্টিব্যল– রথযাত্রা উৎসব, যার বিভিন্ন প্রকারভেদ পলিনেশিয়, দূরপ্রাচ্য, এমনকি জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন জাতিদের মধ্যে দেখা যাবে।.. দ্রাবিড় ভাষায়ও (তামিল) 'যাত্রে' অর্থ গমণ। দেব-দেবতার এই গমন-নির্গমন উপলক্ষে, আরও পরবর্তীতে রাজসিংহাসন আরোহণ কালে যে সব অনুষ্ঠান উৎসব, বিভিন্ন উপাচার, ট্যাবু এবং নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে উদযাপিত হত- তাই সম্ভবতঃ ছিল যাত্রা উৎসব। এইভাবেই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে 'কৃষ্ণযাত্রা' দোল উৎসবে 'দোলযাত্রা' রাম-সীতাকে স্মরণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

> 'রামযাত্রা' এবং অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত বহু 'যাত্রার নামও পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তী যাত্রাগানে তাই দেখি ধর্মযাত্রার বেষ্টনী ভেদ করে তা সমাজ, ইতিহাস, কিংবদন্তি, গাঁথা, গীতিকা, এমনকি– রূপকথাতেও প্রসারিত-সম্প্রসারিত, যার আধুনিক রূপ গোনাই যাত্রা, আসমান সিং যাত্রা এবং রূপভান যাত্রা প্রভৃতি।[২]

সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে লোকনাট্য যাত্রার পরিবর্তনের বিষয়টি গবেষকদের দৃষ্টিতে একটি বৃহৎ সময়ের ইঙ্গিত দেয়। কোনো কোনো গবেষকের মতে, যাত্রার বিবর্তন প্রক্রিয়াটি অনেকটা মানব সভ্যতার পরিবর্তনের মতো। দেবতার উৎসব থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তবেই যাত্রানাট্যের রূপ লাভ করে শত পঙ্কিলতার অনুপ্রবেশ সত্বেও ঐতিহ্যবাহী এ নাট্যাঙ্গিক আজও তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। গবেষকের বর্ণনায় ঋগ্বেদে উল্লিখিত সম্রাট কল্লব্রাত্যের দ্বিগ্বিজয় যাত্রার কথা জানা যায়, যেখানে বলা হয়েছে রাজারা বৎসরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্য পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে লোক-লস্কর নিয়ে যে যাত্রা করতেন সেই বিহার যাত্রার মধ্যদিয়ে মৌর্য রাজপুরুষদের ঢাকঢোল বাজিয়ে দ্বিগ্বিজয় যাত্রার পর রথযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা,[৩] দোল যাত্রা, মন্দির প্রাঙ্গনের যাত্রা, বারোয়ারি পুজার যাত্রা, পালাযাত্রা, গীতিনাট, নাটগীত ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যদিয়ে লোকনাট্য যাত্রাপালায় পরিণত হয়েছে।[৪]

গমন বা শুভযাত্রা থেকে যাত্রা সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিতে কেমন করে নাট্যাঙ্গিকের রূপ নিলো এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তা নিম্নরূপ:

> যাত্রা বলিলে উৎসবকালীন দেবচরিত্রাভিনয় বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে গমনরূপ ব্যাপার রাসযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, প্রভৃতি দেবলীলার ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে সমারূঢ় রাখিবার জন্য কতকগুলি লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক এক স্থানে সমাগমপূর্বক ব্যক্তি সাধারণের নিকট তদ্ব্যাপার প্রদর্শনার্থ একটি ধরাবাহিক চরিত্র চিত্র সমুপস্থিত করে। এই ব্যাপার ক্রমে উৎসব বা যাত্রা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে দেবচরিত্রাংশ অতি গভীর পুজা আড়ম্বর ও ভক্তিসহ আনন্দতরঙ্গে নাচগান মিশ্রিত হইয়া লোকসমাজে প্রকটিত হয় তাহাই যাত্রা।[৫]

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে সময় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই দেবতার উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া যাত্রা শোভাযাত্রা হয়ে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়ে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে গিয়েই নাট্যনুষ্ঠান যাত্রানাট্যের রূপ ধারণ করেছে। তাঁর এ মতকে সমর্থন করার যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রচনাকালে বিভিন্ন গবেষক একই ধরনের মতবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। একই কারণে নগেন্দ্রনাথ বসু

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের প্রারম্ভে মন্দিরে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণবিষয়ক লীলাগানকে যাত্রাপালার প্রাথমিক স্তর হতে একটু উন্নত স্তরের যাত্রাপালা বলে মনে করেছেন।[৬] মন্দিরে এসকল লীলানাট্যকে তিনি গেয় ঢঙের যাত্রাপালা বলেই মনে করেছেন।

যাত্রানাট্যের কালানুক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া তাঁর "বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র" গ্রন্থে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেও সময়ের অগ্রযাত্রায় নাটক হয়ে উঠতে যাত্রাপালাকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে বলেই তিনি মনে করেছেন। সাইমন জাকারিয়ার মতে, যাত্রা সময়ের প্রয়োজনে বিষয়, আঙ্গিক এবং রূপগত এই তিন ধরনের পরিবর্তননের মাধ্যমে পরিণত নাট্যাঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি বলেন-

> বাংলা 'যাত্রা, শব্দের অর্থ গমন। এই অর্থের সাথে সাযুজ্য ধরে এসেছে 'যাত্রাগান' বা 'যাত্রাপালা'। দূর অতীতে তিথি বা নক্ষত্রযোগে কোথাও 'যাত্রা' শব্দটির প্রচলন ছিল এবং সেই যাত্রার ধরন ছিল অনেকটা শোভাযাত্রার মতো। তবে, প্রাচীনকালে নাট্যরীতি 'যাত্রাগান' বা 'যাত্রাপালা' হয়তো ছিলো না, কিন্তু গীতবহুল একধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রচলন ছিল। [৭]

অন্যদিকে সনৎকুমার মিত্র যাত্রা শব্দটি অভিনয়ের সাথে সংযুক্তির ব্যাপারে যাত্রার প্রাগৈতিহাসিক রূপ সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে প্রমাণ স্বরূপ তিনি স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। কৃষিনির্ভর প্রাচীন সমাজের মানুষেরা সূর্যের সেই যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতের সংমিশ্রণে যে অনুষ্ঠান পালন করতে' সে বিশ্বাস ও আচারের মধ্যে তিনি যাত্রাভিনয়ের প্রথমিক রূপ লক্ষ করেছেন।

> সূর্যদেবতার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে অভিগমনকে কেন্দ্র করে কৃষি নির্ভর সুপ্রাচীন সমাজ নিশ্চয় এমন সব উৎসব পালন করতো, যা তাদের সু-শষ্যের সহায়ক হতে পারে। সূর্যের আয়ন গতির দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যাবে যে, তার প্রধান প্রধান গতি সঞ্চার কাছাকাছি সময়ে এমন কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার সাথে যাত্রা শব্দটি যুক্ত আছে। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দল বা ঝুলন যাত্রা, রাস যাত্রা, দোল যাত্রা। [৮]

যাত্রার প্রাগৈতিহাকি যুগের রূপ সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষের অভিমতও পূর্বের গবেষকদের অনুরূপ। তিনি দেবপূজার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট যাত্রাকে যাত্রাপালার আদি রূপ হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে।

> যাত্রা অর্থ গমন। পূর্বকালে দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেববিগ্রহ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা অর্থাৎ গমন করা হত। যেমনঃ স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। দেববিগ্রহের পিছনে পূজারী ও ভক্তবৃন্দও শোভাযাত্রা করে যেতেন। সেই শোভাযাত্রায় দেববন্দনা গানের সঙ্গে মানবিক সমাজ প্রসঙ্গ, রঙতামাসা,

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলত। নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহুসঞ্চালন, পদচারণা এবং মৌখিক অভিব্যক্তিও চলত। এমনিভাবে দেবশোভাযাত্রায় ভক্তিরসের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গির সংযোগ ঘটেছিল। [৯]

ড. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যাত্রা বিষয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম গবেষণা করেন ১৮৮২ সালে। সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ গবেষণা করেছিলেন। আমরা যাত্রার আদি রূপ সম্পর্কে তাঁর মত আলোচনা করে এ পর্বের আলোচনা সমাপ্ত করব। তিনি বলেন–

যাত্রা নামের উৎস হলো গমন করা অর্থে যা। সুতরাং যাত্রা অর্থ হবে প্রথমত গমন, একটা স্থান ত্যাগ। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ ঊষাযাত্রা অর্থাৎ ঊষালগ্নে স্বগৃহ থেকে বের হওয়া; মহাযাত্রা অর্থাৎ মৃত্যু, গয়া যাত্রা অর্থে তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, যাত্রা বলতে কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কোন শোভাযাত্রা বুঝায়। যথাঃ দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী যাত্রা, রাসযাত্রা, যা বছরে তিন বার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যথাক্রমে বসন্তে, বর্ষায়, শরতে। তৃতীয়ত যাত্রা বলতে এক প্রকার জনপ্রিয় নাট্যাভিনয় বোঝায়। এই নাট্যাভিনয়ের উৎস সম্ভবত উপরিউক্ত তিনটি উৎসবের সঙ্গে জড়িত ছিল। [১০]

সিদ্ধান্তঃ উপরিউক্ত গবেষকবৃন্দের মতের সপক্ষে আমাদের সহানুভূতি রইল এই জন্যই যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকনাট্য যাত্রাপালা সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য কোন আলোচনা নেই। উক্ত অভিমত থেকে আমরা জেনেছি আদি যুগের দোলযাত্রা, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, দেবশোভাযাত্রায় ভক্তিরসের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গির সংযোগ ঘটে ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রার পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে।

প্রাচীন যুগের যাত্রারূপঃ এযুগের যাত্রায় নাটকের উপস্থিত না থাকলেও এ সময়ে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে যে নাট্যগুণ পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে যাত্রাপালার প্রাচীন রূপের নিদর্শন আছে বলে গবেষকগণের আলোচনা থেকে জানা গেছে। বাংলাভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যে যে নাট্যাঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে অনেক গবেষক লোকনাট্য যাত্রার ইঙ্গিত আছে বলে মনে করেছেন। চর্যাগীতিকায় উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ দেখে কোনো কোনো গবেষক তাকে আদি প্রাচীন লোকনাটক বলেই মনে করেছেন। এমন একটি ধারণা পাওয়া যায় বিশিষ্ট নাট্য গবেষক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের গবেষণা থেকে। তাঁর অভিমতটি নিম্নরূপঃ

চর্যাপদে বাদ্যযন্ত্র হেরুক বীণার উল্লেখ আছে। তাল মানের উল্লেখ আছে। বোঝা যাচ্ছে নৃত্যগীতের মধ্যদিয়ে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হচ্ছে। এ কিন্তু সংস্কৃত ছল্লিক নয়। এ হল বাংলা নাটকের আদি রূপ; নাটক নৃত্য শব্দের সঙ্গে তখন যুগল বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'নাটক' শব্দটির এই অর্থ-ঔদার্য

Dhaka University Institutional Repository

> আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও আমরা একই অর্থ প্রত্যক্ষ করব।..বুদ্ধনাটক চর্যাপদগুলির মত নিশ্চয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১১]

দেবযাত্রার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকালের শুভযাত্রাই কালের পরিক্রমায় মন্দির প্রাঙ্গনে স্থিত হয়ে দেবকাহিনী নির্ভর পালায় রূপ লাভ করে যাত্রা তার শোভাযাত্রা খোলস ত্যাগ করে বিনোদন অনুষ্ঠানে পরিণত হল।[১২] নাচগানের মাধ্যমে দেব মাহাত্ম প্রকাশের নিমিত্তে জন্ম হল কৃষ্ণযাত্রা। কৃষ্ণবিষয়ক লীলাগান কে প্রাচীনকালে যাত্রা বলে অভিহিত করা হত। তখন যাত্রায় বর্তমান কালের মতো সংলাপ ছিল না। প্রাচীন যাত্রায় গানের মাধ্যমের পালাকারেরা তাদের নাট্যিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন। আর এরই ধারাবাহিকতায় জয়দেবের গীত গোবিন্দকে অনেক গবেষক লোকনাট্য যাত্রার প্রাচীন রূপ বলে অভিহিত করেছেন।

অভিনয়ের আঙ্গিক হিসাবে যাই হোক জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাটক হিসাবে পরিণত রচনা এমন মত প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত নাট্য গবেষক সুরেশচন্দ্র মৈত্র। তাঁর অভিমটি নিম্নরূপ:

> 'গীতগোবিন্দ' নটগীত আকারে লেখা। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন। আর পদ্মাবতী তার অনুরূপ নাচিতেন, এই অবার্চীন নয়।..,১৭ সংখ্যক চর্যার কথাবস্তুর সংঙ্গে জয়দেব পদ্মাবতী প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে একটি কথা স্পট হবে যে, নাটক তখন ছিল নৃত্য ও গীতের ওপর নির্ভরশীল; আর সমস্ত অভিনয় কাজটি ছিল দুই ব্যক্তির যুগ্ম ক্রিয়াকর্ম। তখনও কথা অধিক প্রশ্রয় পায় নি। নৃত্য ও গীত আধিপত্য করেছে। অভিনয়ের আঙ্গিক যাই হোক জয়দেব লিখিত গীতগোবিন্দ নাটক হিসেবে খুবই পরিণত রচনা।[১৩]

যদিও এ উদাহরণ পূর্বের অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, আবারও দিচ্ছি, প্রযোজন হলে আরও বলব কারণ, যাত্রার প্রাচীন রূপের বর্ণনায় এ দৃষ্টান্তর প্রয়োজন আছে। প্রখ্যাত নাট্য ইতিহাস প্রণেতা আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের মধ্যে যাত্রার প্রাথমিক রূপ খুঁজে পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থ দুটিকে লোকনাট্য যাত্রার প্রাচীন আঙ্গিক বলে মনে করেছেন। তাঁর অভিমত নিম্নরূপ:

> জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীত শ্রেণির রচনা। যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হত বলে ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে কেবল মাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তবু শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়; কারণ তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব লক্ষ করে তাকে 'নতুন যাত্রা' বলে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 'নতুন যাত্রা' কথাটি থেকেই পুরাতন যাত্রা কথাটি সম্ভত:ই এসে পড়ে; মনে হয় মধ্যযুগে নাটগীত যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোত বলে তাকে সাধারণভাবে যাত্রা বলা হোত।[১৪]

যেহেতু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে গদ্যের আবিষ্কার হয়নি, তাই ঐ সময়ে নাটক কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত ছিল। নাট্য গবেষক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের ভাষায়–

> মধ্যযুগে নাটক সাংগীতিকতার কবলে বন্দী ছিল। শুধু বাংলাদেশে নয়, অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেরও এই ছিল সাধারণ সত্য। ঝুমুরসঙ্গীতের পালা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গীত হওয়া সত্বেও নাটক হয়ে উঠেছে– যেমন হয়ে উঠেছে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। আর ছদ্মবেশে নয়, অচিরেই নাটক স্ববেশেই হাজির হচ্ছে।[১৫]

উক্ত গবেষকবৃন্দের মন্তব্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রাচীন যুগের যাত্রার প্রকৃত রূপ ছিল সাঙ্গীতিক। আর এ সময়ের যাত্রার পরিবেশনার ধরন ছিল এমন গেয় ঢঙের।

সিদ্ধান্তঃ উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় প্রতিয়মান হয় যে, সামাজিক পরিবর্তন ও সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে যাত্রাপালার বিষয় ও আঙ্গিকের কিছুটা রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। অমসৃণ থেকে ক্রমশ মসৃণ এবং প্রথা থেকে সাংগীতিকতায় পরিণত হয়ে নাট্যিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

মধ্যযুগের যাত্রাপালাঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কথিত আছে চৈতন্যদেবের অভিনয়ের মাধ্যমেই যাত্রা মন্দির থেকে আসরে চলে আসে। মহাপ্রভুর প্রচেষ্টাতেই যাত্রা আঙিনায় আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে বলে অনেক গবেষক দাবি করেছেন।[১৬] এসময় থেকে যাত্রা গান থেকে ক্রমে নাট্যের রূপ লাভ করে। চৈতন্যদেব নিজে নারী সেজে যাত্রাভিনয় করতেন বলেও গবেষকেরা উল্লেখ করেছেন।[১৭] এমন মত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সকল গবেষক উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কপিলা বাৎসায়ন। কপিলা বাৎসায়ন যে মত ব্যক্ত করেছেন তাতে মনে হয় যাত্রানাট্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের যাত্রার নতুন রূপদানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অভিনয় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় । তিনি বলেন-

> ষোড়ষ ও সপ্তদশ শতকে চৈতন্যের একই আন্দোলন থেকে দুটি স্রোতধারার উদ্ভব হয়। এর একটি হল কীর্তনগান, অন্যটি হয় কৃষ্ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে ঘিরে নাট্যাভিনয়সমূহ। পরে মনিপুরও এই দুটি শিল্পরূপকে গ্রহণ করেছে। এভাবে আমরা দুটি অঞ্চলেই কীর্তন সঙ্গীতের সুস্পষ্ট ঐতিহ্যকে পাই, আর পাই যাত্রাভিনয়কে। [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যদেবের পরই বাংলাদেশে ভক্তি যাত্রার যে জোয়ার আসে তা বাংলা লোকনাট্যে ইতিহিাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখার মতো। এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় সাইমন জাকারিয়ার উক্তিতে। তিনি বলেন-

> নাট্যরীতি যাত্রার প্রথম উপক্রম লক্ষ করা যায় মধ্যযুগে চৈতন্যদেবকৃত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে।...উৎপত্তির প্রথম থেকে যাত্রার আসরে সাধরণত লোককথা, ধর্মীয় পুরাণ কাহিনী, ও পৌরাণিক চরিত্রের আখ্যানে অভিনিত হতে থাকে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চাহিদা অনুযায়ী যাত্রার আসরে লোককথা, রূপকথা, পুরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক, ঐতিহাসিক, ও রাজনৈতিক চরিত্রনির্ভর আখ্যান মঞ্চস্থ হতে শুরু করে এবং বিংশ শতাব্দীতে অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা ও চরিত্র বাংলাদেশের যাত্রা মঞ্চে স্থান করে নেয়। শুধু তাই নয়, এই সময় থেকে যাত্রার আসরে দু'টি স্বতন্ত্র ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার একটি বর্ণনাত্মক গীতিনাট্যের ধারা এবং অপরটি সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের ধারা।[১৯]

সামাজিক যাত্রায় যে পরিবর্তন তা পুরো ঊনিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষা-ভাষি অঞ্চলে পেশাদার ও শখের যাত্রাদলের বিবরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

শিশুরাম অধিকারী তিনি বীরভূমের কেদেলিগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রচলিত কুরুচি প্রভাবিত যাত্রাকে ব্রাহ্মণ শিশুরাম কিঞ্চিৎ পরিশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশন করতেন।[২০] এরপর শ্রীদামদাস ও সুবল অধিকারী দুই সহোদর কৃষ্ণযাত্রায় খুব খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পরমানন্দ অধিকারী (১৭৩৩-১৮২৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রাগান শুরু করেন। প্রাচীন অধিকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পরামানন্দ ঊনিশ শতকের প্রথমে যাত্রায় পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে কিছুটা সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি যাত্রাগানে ব্যাখ্যামূলক 'তুক্ক' ও রসিকতার জন্য ব্যাসদেব চরিত্রের আমদানি করেন। লোচন অধিকারী 'অক্রুর সংবাদ' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' পালায় অভিনয় করে দারুণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[২১]

বদন অধিকারী পরমানন্দ অধিকারীর শিষ্য ছিলেন। প্রথম বয়সে পরমানন্দের দলে তিনি একানে বালকের চরিত্রে অভিনয় করতেন বলে জানা গেছে। তাঁর সময়েও যাত্রার আঙ্গিকে কিছু রূপান্তর ঘটেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যায় 'কলিরাজার যাত্রার মধ্যে। তাঁর মাধ্যমেই একাধিক চরিত্রের অংশ গ্রহণের দ্বারা নতুন যাত্রা অভিনীত হয়। সে সময়ের সমাচার দর্পণেও সে সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। এর কিছুকাল পরে গোবিন্দ অধিকারী (১২০৫-১২৭৭) একটি কৃষ্ণ যাত্রার দল গঠন করেন। গান রচনায় তাঁর খুব খ্যাতি ছিল বলে জানা যায়। অভিনয়ের সময় গোবিন্দ বৃন্দা চরিতে অভিনয় করতেন। গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। এই দলে অন্যান্য যারা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করত তাঁরা কলা পাতার গহনা পরতেন বলে জানা যায়।[২২] বাদ্য যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রায় প্রধান বাদ্য যন্ত্র ছিল তানপুরা, খোল ও করতাল। বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলের অধিবাসী পীতাম্বর অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব সুনাম অর্জন করেন। ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে জানা গেছে।

নদীয়া জেলার ভাজনঘাটের অধিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা অভিনয় করে নদীয়াবাসীকে মুগ্ধ করেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গে এসে যাত্রা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেন। 'স্বপ্নবিলাস' (১৮৩৫) 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'সুবল সংবাদ', 'নন্দ বিদায়', 'ভরত-মিলন', 'গন্ধবমিলন' 'কালিয়দমন, প্রভৃতি পালায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাহার যাত্রাপালায় গদ্যসংলাপ অপেক্ষা গীতিসংলাপ অধিক প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁর অনেক যাত্রাপালা চৈতন্য-জীবনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলে গবেষক জানিয়েছেন।[২৩]

যাত্রাভিনয়ে সংস্কার এনেছিল মদনমাস্টারের (১২১৯-১২৬৩) দল। তিনি নিজে পালাকার ছিলেন। দক্ষযজ্ঞ, হরিশ্চন্দ্র, রাম বনবাস, ধ্রুবচরিত্র, দুর্গামঙ্গল, সীতা-অন্বেষণ, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী প্রভৃতি পালা তাঁর দলে অভিনীত হয়।

যাত্রাগানের জন্য মতিলাল ভদ্রসমাজের কাছ থেকে 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হয়েচিলেন এমন মত প্রচলিত আছে। এই উপাধি দান উপলক্ষে ভট্টপল্লী হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকসহ তিনি একটি স্বর্ণপদকও লাভ করেন। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে 'বিজয় চণ্ডী (১৮৮০) , 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (১৮৮১)'সীতাহরণ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'কর্ণবধ', 'ভরত-আগমন' (১৮৮৮), 'নিমাই সন্ন্যাস', 'ব্রজলীলা', (১৮৯৪) প্রভৃতি গীতাভিনয়ের জন্য মতিলাল রায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। [২৪]

রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র জর্জ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন একটি পেশাদারী যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁহার দলের কৃষ্ণযাত্রার খুব খ্যাতি হয়। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১১) বীরভূম ও কলিকাতা অঞ্চলে নতুন যাত্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর 'মানভঞ্জন', 'দুতী সংবাদ', কলঙ্ক ভঞ্জন, মুথুর, প্রভাস যজ্ঞ, কংসবধ প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রায় জনগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। যশোহর জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন রসিকলার চন্দ্রবর্তী (১২২৭-১৩০০)। 'নিমাই সন্ন্যাস', 'কংসবধ, 'মায়ের ছেলে' প্রভৃতি পালায় অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কৈলাসচন্দ্র বারুই ,আনন্দ অদিকারী ও জয়জন্দ্র অধিকারী , প্রেমচাঁদ অধিকারী, লাউসেন বড়াল, রামকুমার কাঁশারী, নারায়ণ দাস রামকুমা, রামকুমার কাঁশারী, লোকনাথ দাস, কালীনাথ হালদারও প্রমুখ বিশেষ অর্জন করেছিলেন। ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৬) বক্তৃতাধর্মী সংলাপ, পয়ার ছন্দের পালার কাহিনীর অংশবিশেষের

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা ভক্তি, করুণ ও বীররসকে প্রাধান্য দেয়া তাঁর পালার বৈশিষ্ট্য ছিল বলে জানা গেছে। বোকো ও তাঁর ভাই সাধু এই দুইজন একটি যাত্রার দল গঠন করেন সুনাম অর্জন করেছিলেন বলেও গবেষকের জানতে পেরেছি।[২৫]

ঊনিশ শতকের যাত্রায় নারী চরিত্রের উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের চিহ্ন বহন করে। এসময় থেকে যাত্রাপালায় নারীরা অংশগ্রহণ করে। যাপলায় নারী চরিত্রের অভিনয় শুরু হওয়ার পর যাত্রা পরিচালনায় নারীর ভূমিকা গুরুত্ব বহন করে। গবেষকের ভাষায়–

> ঊনবিংশ শতকে প্রথম মহিলা যাত্রার প্রচলন করেন। রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতা কোন বারবিলাসিনী"। ইনি 'বিদ্যাসুন্দর' পালা গাওনা করিতেন। প্রখ্যাত যাত্রাকর মদন মাস্টারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার দল পরিচালনা করেন। নবীনের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী কৈলাসকামিনী দেবী এই দলের অধিকারী হইলেন। কালী ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতা দল পরিচালনা করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় সুগায়ক ও সু-অভিনেতা ছিলেন। দলটি 'বৌমাস্টারের দল' নামে খ্যাত হয়। এই দলে ধ্রুব চরিত্রে, প্রভাবযজ্ঞ, দণ্ডীপর্ব, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি পালার সঙ্গে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' 'সতীনাটক' ও 'হরিচন্দ্র' পালা অভিনীত হইত। উনিশ শতকের শেষে বৌমাস্টারের দল খুব সুনামের অধিকারী হয়। চন্দননগরে বৌমাস্টারের নামে একটি রাস্তা চিহ্নিত রহিয়াছে। এই রাস্তার নাম বৌমাস্টারের গলি।[২৬]

উনিশ শতকের সখের যাত্রা: ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে বরাহমনগর নিবাসী ঠাকুরদাস একটি সখের যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অভিনীত হতো। রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও নিমাই মিত্র দলের অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন।[২৭]

এই দলের যাত্রায় প্রথমে নান্দীগান গাওয়া হয় বলে জানা যায়। এ দলের গায়ক ছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য, কেবলারাম পাল নিমাই মিত্র প্রমূখ খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। দেবতার স্থলে মানবতাকে প্রথম বড় বরে দেখেছিলেন ঠাকুরদাস। 'বিদ্যাসুন্দর' পালাকে ঠাকুরদাস নুতনভাবে সাজিয়ে ছিলেন। ঠাকুরদাস সখের ও পেশাদারী দলের জন্য যাত্রা লিখতেন। তিনি 'হরিশ্চন্দ্র'ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নামে আরো দুটি লোকনাট্য রচনা করেন বলে জানিয়েছেন।[২৮]

যাত্রার হারানো ঐতিহ্য পুণপ্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতার ধনী গুরুচরণ সেনের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীনাথ সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল করেন। এই দলের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গান রচনা করে দিতেন বলে জানা গেছে। এই সময় বাংলার প্রতি পল্লীতে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয় গান সমূহ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। উনিশ শতকেই যাত্রাপালাকে পেশা হিসেবে নিয়ে যাত্রাপালা আর একবার নতুন রূপান্তরের মুখোমুখী দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের অভিমত নিম্নরূপঃ

> বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দেওয়ান জোড়াসাঁকো নিবাসী রামচাঁদ হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করিতেন। কবিতা রচনা ও সংগীতবিদ্যায় তিনি। পারদর্শী ছিলেন। উনিশ শতকের পেশাদার যাত্রার দলগুলি সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য যাত্রা পরিবেশন করেছিল। কিন্তু "ভদ্রবিদ্ধান লোক তাহাদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই। এই সময় রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯খ্রি. একটি সখের যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি মার্জিত রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গাওনা করিতেন। তাহার দলে 'নন্দবিদায়' পালা অভিনীত হইত। এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রী চরিত্র মেয়েরা অভিনয় করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটিতে নন্দবিদায় যাত্রার তৃতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রার রামচাঁদ খুব সুনাম অর্জন করেন। 'ছিদাম' নামে অনূর্ধ্ব তের বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার গানে তাবৎলোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। দলের দ্বিতীয় বালিকা পুঁটি'র সখী গানও অতি উত্তম ছিল। তাহার কণ্ঠে গীত নন্দবিদায়ের একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে, –
>
> আড়ানবাহার আড়া খেম্‌টা
>
> চোবেরর বিচারে রাজা করে জানিরে অন্তরে।
>
> রাজা হয়ে চুরি করে তার বিচার কে করে॥
>
> তুমিত ভাই রাখাল রাজা, ব্রজ বালক তোমার প্রজা
>
> মধুপুরে হলে রাজা ব্রজবাসীর মন হরে॥
>
> ঘরে ঘরে মুখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি
>
> বাঁশীর গানে মন চুরি করেছ তুমি–
>
> দ্বিজ রামচন্দ্রের চিন্তে ও চোর কে পারে চিনতে
>
> যে মজেছে পদ প্রান্তে কৃতান্তে সে তুচছ করে॥ [২৯]

Dhaka University Institutional Repository

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প এক ধরনের সংকটের মুখে পড়ে। এ সময় বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের পালাদল সম্পর্কে অধ্যাপক সুশান্ত সরকার গবেষণা থেকে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি।

তিনি বলেছেন-

> যাত্রাশিল্পের ক্ষেত্রে একটা দারুণ পালাবদল ঘটে ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর। তৎকালে বাংলাদেশের খ্যাতনামা যাত্রাশিল্পী, পালাকাররা দেশ ত্যাগ করেন। শরীয়তপুরের গঙ্গনগরের ব্রজেন দে, সাতক্ষীরার সত্যপ্রকাশ দত্ত, জামালপুরের জীতেন বসাক, বিক্রমপুরের জ্যোৎস্না দত্ত, প্রমূখ দেশ ত্যাগ করেন, তেমনি বরিশালের নট্য কোম্পানীও দেশ ত্যাগ করেন। যাত্রার ক্ষেত্রে এই শূণ্যতা পুরণ হতে সময় লেগেছিল। এ প্রসঙ্গে যাত্রাশিল্পের কালানুক্রমি ইতিহাসে ধারায় একটি বিষয় উল্লেখ্য- কলকাতা কেন্দ্রিক বাবু কালচারের প্রচণ্ড পূর্ব বাংলায় না লাগার ফলে, এ অঞ্চলে জমিদার, গতিদার, তালুকদার শ্রেণি বিত্তশালীদের পৃষ্টপোষকতায় গড়ে উঠেছিল অপেশাদার সৌখিন যাত্রাদল। এইসব শখের যাত্রাদলের প্রয়াসে যাত্রাশিল্পের যেমন চর্চা হয়েছে, তেমনি এই শখের দলের ভেতর থেকে গড়ে উঠেছে পেশাদার যাত্রা শিল্পী ও কলা-কুশলী। পূর্বপাকিস্তানে তথা পূর্ববঙ্গে সমকালে অপেশাদার সৌখিন যাত্রা শিল্পীরা বিচ্ছিন্নভাবে যাত্রাশিল্পকে ধরে রেখেছিল।[৩০]

সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালার অবস্থান সম্পর্কে বাংলা পিডিয়াতে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত বিভাগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির কারণে যে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় তা থেকে উত্তরণের জন্য যাত্রাশিল্পের নবরূপ ও নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। প্রাচীন যাত্রাগুলিতে ধর্ম, পদ্য সংলাপ, ও সঙ্গীতের প্রাধন্য ছিল, কিন্তু আধুনিক যাত্রা অভিনয় ও সংলাপ; উপরন্তু বর্তমানে তাতে আধুনিক সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যাত্রায় সুসংবদ্ধ কাহিনীর সংযোগ ও সংলাপের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তা এখন একটি উন্নত মানের শিল্পমাধ্যমে পরিণত হয়েছে এবং গীত ও অভিনয়ে পারদর্শী লোকের সমন্বয়ে যাত্রার পৃথক পৃথক দল গড়ে উঠেছে। এসব দল পেশাদার ও ভ্রাম্যমাণ।[৩১]

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে বাংলাদেশের যাত্রাপলায় স্বর্ণযুগ এসেছিল। এসময় কেবল মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে শতাধিক পালা রচিত ও অভিনিত হয়েছে যা যাত্রাপালার বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে কালের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে আছে। গবেষকের মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য যাত্রাপালা। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মত নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

মন্মথ রায়ের,'আমি মুজিব নই.(১৯৭১), 'উৎপল দত্তের, 'জয়বাংলা'(১৯৭১), 'নরেশচক্রবর্তীর, 'সংগ্রামী মুজিব'(১৯৭১), নিরাপদ মণ্ডলের 'মুক্তিফৌজ'(১১৯৭১), সত্যপ্রকাশদত্তের 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর'(১৯৭১), ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের' বঙ্গবন্ধুর ডাক'(১৯৭১), 'সাকোটির মুজিব' লেখকের নাম জানা যায় নি।, অরুণ রায়ের 'আমি মুজিব বলছি'(১৯৭২), ব্রজেন্দ্রকুমার-দের 'মুজিবের ডাক'(১৯৭২)' সাধন চক্রবর্তীর 'শেখ মুজিব'(১৯৭২), মৃণাল করের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'(১৯৭২), এ পালাটি সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে ঢাকার মহানগর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয় বলে তপণ বাগচী জানিয়েছেন। পরিতোষ ব্রহ্মচারীর 'নদীর নাম মধুমতি'(১৯৭৪), বিপিন সরকারের 'মুক্তিসেনা'(১৯৭৪)[৩২]।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের মঞ্চে ছোট বড় মিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক যাত্রাপালা অভিনিত হয়েছে। ঐ সময় পরিধিতে যাত্রা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় অভিনয় জগতে ঐতিহাসিক স্থান করে নেয়। বিশ শতকের যাত্রার জনপ্রিয়তার মূল কারণ পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে সামাজিক সমস্যা নিয়ে যাত্রাপলার মঞ্চায়ন। এ প্রসঙ্গে বজলুর রহমান ভূইঞার আলোচনা থেকে আমরা শেষ দশকের যাত্রাপলার আবেদন সম্পর্কে জানতে পারি।

> গত ১৯৯৪-৯৫ সালে জাতীয় যাত্রা অনুষ্ঠানে আমি এক হাজার দর্শকের এক মতামত জরিপ করি, যাত্রা প্রসঙ্গে তাতে আশি ভাগ দর্শক আর্থ-সামাজিক ভিত্তিক রচিত যাত্রার পছন্দের কথা জানান। এর থেকে বুঝা যায় যাত্রা দর্শক এক এক রূপান্তরের অপেক্ষা করছে। সুতরাং এখনই যথাযোগ্য সময় যাত্রাকে এক বিবর্তন রূপে আবির্ভাব করানো, আমাদের পক্ষে এটা কি সম্ভব? [৩৩]

তবে একথা ঠিক যে নব্বইয়ের দশক থেকেই যাত্রাপালা ক্রমান্বয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বলেন-

> এখনকার যাত্রা হচ্ছে খিস্তি-খেউড় আর নগ্ননৃত্যের আখড়া। মহানন্দে নায়িকার পোশাক আসরেই ষোল-সতের বার খোলা হচ্ছে। নায়িকার সম্বন্ধে পালাকার লিখেছেন যথাসম্ভব স্বল্পভাষা, বিজ্ঞাপন পড়ছে আসরে দর্শন, আলো-আধারিতে পোশাক পাল্টানো। কিছু কিছু আবার বিপরীত চরিত্র এসে আসরে একগাদা খিস্তি দিচ্ছে, যার মধ্যে শুয়োরের বাচ্চা ডজন খানেক। আমাদের মনে হয়, লোকশিক্ষার যে কর্তব্য তা ভুলে গেছেন এই সব পালাকার, প্রযোজক এবং শিল্পীরা। [৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের শেষ দশক থেকে যাত্রা শিল্প ঠিক কী কারণে অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হল তার একটি কারণ উল্লেখ করেছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব গোলাম সারোয়ার । তাঁর অভিমতকে আমরা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার চেষ্টা করব। তিনি বলেছে,

> যাত্রায় অশ্লীলতা আমদানী কে করেছে, সে বিষয়ের গভীরে যাওয়া হয় নি। বরঞ্চ যাত্রাশিল্পকে ঢালাও ভাবে দায়ী করা হয়েছে। যাত্রা খারাপ, যাত্রা মানে অশ্লীল, যাত্রা করে ফাত্রা লোক ইত্যাদি। সন্তান যতই খারাপ কাজ করুক সেতো সন্তান। তাকে শোধরাবার দায়িত্ব কে নেবে? তাকে খারাপ করলই বা কারা? প্রকৃত যাত্রাশিল্পীরা কি যাত্রার অশ্লীলতার জন্য দায়ী? .. একথা বলতে দ্বিধা নেই যাত্রা প্রযোজনায় কিছু কিছু ব্যবসায়ী এর ঐতিহ্যকে বিকৃত করে ব্যবসাকে মুখ্য করে নিয়েছে। শিল্পকে করেছে পণ্য। বড়ই দুর্ভগ্য বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা বলছে যাত্রাই আসলে অপসংস্কৃতির উৎস; সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দিলেই সামাজিক অন্যায় অনাচার এবং অপসংস্কৃতি রোধ হবে। সাময়িকভাবে জয়ী হয়েছে তারাই। ঐতিহ্যের চর্চা করে যে, অপসংস্কৃতি রোধ করা যায় না, তাদের তা বোঝানো কঠিণ। এই যাত্রাকে যারা সুকৌশলে অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে সেই সব জ্ঞানপাপীদের সনাক্ত করা প্রয়োজন। যাত্রাকে যারা অপসংস্কৃতি আখ্যায়িত করে ঘোলাজলে মাছ শিকার করার মতোই চিরতরে এই শিল্পকে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। [৩৫]

সিদ্ধান্ত: প্রচীনকালের যাত্রা যে ঐতিহ্যবাহী চরিত্র নিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু করেছিল, কালের বিবর্তনে তার নানা রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজো বিদ্যমান আছে। যাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র যেমন পুর্বে ছিল তা এখনও বিদ্যমান আছে। তবে সময়ের পরিক্রমায় সমাজ ও সংস্কৃতির মতোই যাত্রাশিল্পের উজ্জ্বলতা কখোনও কিছুটা ম্লান হয়েছে। আর সাহিত্য শিল্পের জগতে এ বিষয়টি প্রায় সকল কালে সকল দেশেই এ উত্থান ও অবক্ষয়ের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এমনটি হওয়ার কারণে কোন দেশের সাহিত্য যেমন বাতিল করা হয় না তেমনি ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রাও সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশঃ

১. মমতাজ উদ্দীন আহমদ, *যাত্রার বিবিধ অর্থ*, জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৯৭৯-৮০।

২. আশরাফ সিদ্দিকী, *যাত্রা*, জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা, বাংলাদেশর শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯২-৯৩।

৩. সাইমন জাকারিয়া, বাংলাদেমের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল,২০০৮, পৃ. ১৪৯-৫০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৫. নগেন্দ্রনাথ বসু, যাত্রাঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ,(সম্পাদকঃ সৈকত আজগর, বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প, বাংলা একাডেমি, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০২)। পৃ. ৩৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭

৭. সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

৮. সনৎ কুমার মিত্র, যাত্রাঃ থিয়েট্রিক্যাল অপেরা (প্রবন্ধ) সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৮৩ পৃ. ২১৬।

৯. ড. অজিত কুমার ঘোষ, যাত্রাঃ সেকাল ও একাল, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০১।

১০. অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

১১. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

১২. তপন বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭।

১৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

১৪. আশুতোশ ভট্টাচর্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১৫. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮।

১৬. তপন বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ,২৮।

১৭. তপন বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ,২৮।

১৮. কপিলা বাৎসায়ন, ‘ভারতের লোকনাট্য ঐতিহ্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬৫।

১৯. সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

২০. ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

২১.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

২২.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩।

২৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

২৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

২৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

২৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

২৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

২৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

২৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৩০.অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

৩১.বাংলা পিডিয়া, অয়েব সাইট।

৩২.তপন বাগচী, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৫।

৩৩.বজলুর রহমান ভূইএগ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

৩৪. ব্রজেন্দ্রকুমার দে, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৮।

৩৫.গোলাম সারোয়ার, যাত্রার সংকট: একাল ও সেকাল, সৈকত আজগর প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

দেববন্দনা উপলক্ষ্যে বৈদিক যুগে গীতিবাদ্য সহযোগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শোভাযাত্রা বের করা হতো। এই শোভাযাত্রার 'যা' ধাতু থেকে যাত্রা কথাটির জন্ম। তারপর বহু বছর বহু শতাব্দীব্যাপী যাত্রা কথাটি শোভাযাত্রা উৎসব বা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বন্দী ছিল।[১] অভিনয় অর্থে যাত্রার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৬ শতকের শুরুতে। শ্রী চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) অভিনয় সাহিত্যের ইতিহাসে যে পালটি প্রথম মঞ্চায়িত হয় তার নাম "রুক্মিনীহরণ পালা"। তারপর থেকে বংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল যাত্রাপালা। বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বদেশপ্রেম, জাতীয় জাগরণ ও সাম্য-মৈত্রীর বহু বিচিত্র ঘটনার বিবরণ আমরা যাত্রা পালায় দেখতে পাই। আর এ কারণেই কবি শামসুর রাহমান বলেছিলেন- 'যাত্রা উঠে এসেছে বাংলাদেশের হৃদয় হতে।[২] এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর যাত্রাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে যাত্রাপালায় বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি কতোটা এবং কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

বিদ্রোহ, রজাগরণ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশকে ধারণ করে আছে এদেশের যাত্রাপালা। যাত্রাপালায় সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা মিলন কান্তি দে বলেছেন:

> বাংলার ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ আর সবুজ প্রকৃতির ওপর বার বার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে সম্রাজ্যবাদী অশুভচক্রের। ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালি জাতি প্রতিটি হামলা প্রতিহত করেছে। দেশমাতৃকার জন্য তাদের মরনপণ লড়াই করতে হয়েছে। 'একই মায়ের সন্তান হিন্দু মুসলমান' - এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছে তারা। এ বিদ্রোহ জাগরণ আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে গেছে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা।[৩]

প্রাচীনকালে যাত্রার বিষয় ছিল ধর্মীয় বা দেব–দেবীর কাহিণী নির্ভর। সে সময়ের যাত্রায় তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির ধর্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় বহন করে। 'কথায় আছে, কানু ছাড়া গীত নেই।' সেকালের যাত্রার প্রধান বিষয় ছিল 'কৃষ্ণযাত্রা', 'কালীয়দমন যাত্রা' ইত্যাদি। এসকল বিষয়গুলোর মধ্যে তৎকালীন সমাজের চর্চিত বিষয় ও রুচিকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন যাত্রাগুলোর অভিনয় অনুসঙ্গের মধ্যে তৎকালীন সমাজের মানুষের রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি থেকে। তিনি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

> এখনকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর । প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি যে গ্রামে একবার এই যাত্রা হইয়াছে, সে গ্রামনিবাসীগণ সময় পাইলে কখনও কখনও তদ্বিষয়ে স্পর্ধা করিতে ক্রটি করেন না। অন্য যাত্রা অপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার কসজ্ঞতা বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কাব্য কি নাটক, কি নাটকাভিনয়, এ সকলের নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কাব্য কি নাটক, কি নাটকাভিনয়, এ সকলেরই উদ্দেশ্য হল মানুষ্য হৃদয়ের চিত্র।[৪]

বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক রুচির পরিচয় পরিস্ফুটিত হওয়ার কথা গবেষকের উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে তৎকালে যাত্রাপালার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের বিষয়টিও লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য শ্রীচৈতন্যদেব যাত্রাভিনয়কে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রার প্রতি বাঙ্গালির দুর্বলতা রয়েছে, তাই যাত্রাকে তিনি তৎকালীন সমাজের মানুষের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট যাত্রাগবেষক তপন বাগচী বলেন-

> যাত্রাগানের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার, এই সময়েই যাত্রা তার শোভাযাত্রার খোলশ ছেড়ে আঙিনায় আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে। উৎসব কেন্দ্রিক পরিবেশনার বাইরে যাত্রা উপস্থিত হয় শ্রীচৈতন্যের সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে।.., বড়ুচণ্ডীদাস ১৫০০ সালে যখন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের বয়স মাত্র ১৪ বছর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব থাকলেও শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর গীতাভিনয়ে নিজস্ব অভিনয় পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত নাটকের ধ্রুপদ ব্যবহার করেন নি। চারিদিকে দর্শক-শ্রোতা,মাঝখানে আসরে নৃত্য, গীত ও কথার মাধ্যমে তিনি 'রুক্মিনীহরণ', 'ব্রজলীলা', 'রাবণবধ' প্রভৃতি পালা পরিবেশন করেছেন। শোভাযাত্রা যে যাত্রা হয়ে উঠেছে, তা কৃষ্ণযাত্রার উৎসব উপলক্ষে কাব্য কী নাটক , কী নাটকাভিনয় , এ সকলেরই উদ্ভব হয়েছে চৈতন্যদেবের অভিনয় থেকেই।[৫]

যাত্রাপালার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেদনের কারণেই চারণ কবি মুকুন্দ দাশ (১৮৭৮-১৯৩৪) স্বদেশি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে যাত্রাকে গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। কারণ বাঙ্গালির সমাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির মূল শ্রোতধারাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি বাঙ্গালির চৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্য স্বদেশি যাত্রা রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশি যাত্রা 'মাতৃপূজায়' যে সকল বাণী উচ্চারণ করতেন তা তৎকালীন বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) কারণে সৃষ্ট সামাজ জীবনের অস্থির চিত্রকেই ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম / তবে ফিরিঙ্গি বনিকের গৌরব রবি / অতল জলে জুড়িয়ে দিতাম।"[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপকে ধারণ করার গৌরব যাত্রাপালার একটি বিশাল সাফল্য বলে এমন একটি অভিমত ব্যক্ত করেছে ড: শশিভূষন দাশগুপ্ত। শশিভূষন দাশগুপ্ত তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ' বইয়ের ঊনবিংশ শতাব্দির বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীন পটভূমি অধ্যায়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপঃ

> পাশ্চাত্তের আদর্শে গঠিত রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্তের ভাবাদর্শ ও রূপাদর্শের সহিত আমাদের বাঙলা নাটকের ঐতিহ্যকে গিরিশচন্দ্র এমন সহজভাবে মিলাইয়া লইয়াছিলেন কোন কৌশলে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের বিচার করিতে গিয়া অনেকেই আজকাল কিঞ্চিত অবজ্ঞাভরে বলিতে শোনা যায়, গিরিশচন্দ্র ঠিক নাট্যকার ছিলেন না– তিনি ছিলেন যাত্রাওয়ালা। আসলে কিন্তু এখানেই গিরিশচন্দ্রের সাফল্যের মূল রহস্য। তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যপ্রতিভাকে ঘিরিয়া একটি খাঁটি যাত্রাওয়ালা পরিমণ্ডল একান্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা না হইলে নব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাদর্শ তৎকালীন বিশিষ্ট একটি দর্শকগোষ্ঠীর ভিতরে হয়তো কিছু কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিত কিন্তু তাহা সমগ্র বাঙ্গালি জাতির নিকটে গ্রাহ্য হইয়া উঠিতে পারিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের প্রাণধর্মের সহিত গিরিশচন্দ্রের গভীর পরিচয় ছিল। নাট্য-সাহিত্যের নবাগত ধর্মকে তিনি সেই বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়া আবর্তিত প্রাণধর্মের সহিত যুক্ত করিয়া ছিলেন।[৭]

লোকনাট্য যাত্রাপালার মধ্য দিয়েই বাঙালির হাজার বছরের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে লালন করে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে বলেও তিনি বিশ্বাস করেন। বাঙালির সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির ইতিহাসের লোকনাট্য যাত্রাপালার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই তিনি মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

> হাজার বৎসর প্রাচীনকাল হইতে আমরা যেমন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের সন্ধান পাই, তেমনি সেই প্রাচীনকাল হইতেই আমরা বাঙলা নাট্য সাহিত্যের উপকরণ পাইয়া থাকি। আমাদের বিশ্বাস এই হাজার বছর ধরিয়া আমাদের নাট্য সাহিত্যেরও একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের ধারা চলিয়া আসিয়াছে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

ষোল শতকের দিকে তৎকালীন হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ে হিন্দু সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাত্রাপালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তৎকালে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা অভিনিত যাত্রাপালায় ঐ সমাজের মানুষের সমাজ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মের সাম্যের বাণীর বিপরীতে শ্রীচৈতন্যের যাত্রাভিনয় ঐ সময়ে বহুভাগে বিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবতার বাণী পৌঁছে দিয়ে একটি সম্প্রীতিময় সমাজ ও সংস্কৃতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জন্মাষ্টমীর সময় নন্দোৎসবে যে চৈতন্যদেব 'ব্রজলীলা' নাট্যানুষ্ঠান করেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে। চৈতন্যের সঙ্গে কাশীমিশ্র, নিত্যানন্দ সার্বভৌম, কানাই ঘুটিয়া, তুলসি পাত্র, জগন্নাথ মাইতি প্রমুখ বহু বৈষ্ণব অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৯] এই অভিনয়ে তৎকালীন সমাজে মানুষের সামাজিক সংস্কৃতিক অভিরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনা না জানে প্রভু রুক্মিনী আবেসে কতার মধ্যে।[১০]

শ্রীচৈতন্যদেবের পর বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবেশ আমরা লক্ষ করি তা দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক চালচিত্র বিনির্মাণে ঐ সকল যাত্রাভিনয়ের ভূমিকা অতুলনীয়। শিশুরাম অধিকারী থেকে শুরু করে বোকোর দল পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসর যাত্রাপালায় আমরা বাঙালির যে চরিত্রের সন্ধান পাই তা একান্তই কৃষ্ণাবেশী বাঙালি। তাদের এ আবেশের কারণেই মুসলমান শাসকরা নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করে।[১১] বিনয়ঘোষের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' বইয়ে তৎকালিন সমাজের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে ভীষণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার প্রকৃত চিত্র আমরা সে সময়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে অবলোকন করেছি।

সমসাময়িক কালে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির বিকৃত চিত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে সামান্য কিছু পাওয়া যায়। তবে তার প্রকৃত চিত্র পেতে হলে আমাদের তৎকালীন সময়ে বহুল জনপ্রিয় যাত্রাপালা বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। আমরা বুঝতে পারি যাত্রাপালায় সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতি কতটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন সমাজের রুচি বিকৃতি সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত তুলে ধরলেই বুঝতে পারব যাত্রাপালায় সামাজিক প্রতিক্রিয়া কত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

> আমরা এ পর্যন্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের সসজ্জতার আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে এই যাত্রার নীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার অধিক প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা বলিব তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালীনী , সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটি লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিনটির মধ্যে কোনটি অনুকরণীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় তাহার কন্যার চরিত্র হোক, অথবা সুন্দরের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

> তাহার পুত্রের চরিত্র হউক। কেই বা মনে করে মালিনীর ন্যায় তাহার গৃহিণী হউক অথবা দাসী হউক । লোকে এরূপ প্রার্থনা করা দূরে থাকুক বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটির মধ্যে কোনটিও আদর্শযোগ্য নহে বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয় তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ষ ব্যতিত আর কি শিক্ষা হইতে পারে । কখনও কখনও কবিরা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমত ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি ভয় এবং ঘৃণা উভয়ই অনিবার্য হইয়া পড়ে।[১২]

ঊনবিংশ শতকে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার ছোয়া বাঙালির জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালাকেও কলঙ্কিত করেছিল বলেই বিদেশি নাট্যকার লেবেদেপ বাংলায় নাটক রচনা করে খ্যাতিঅর্জন করেছিলেন। ঐ সময়ে যাত্রানাট্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সে বিষয়ে ড: দর্শন চৌধুরির অভিমত নিম্নরূপ:

> পলাশীর যুদ্ধের পর তখন ও পঞ্চাশ বছর কাটে নি। কলকাতা তখনো শহর হয়ে ওঠেনি, ওঠেছে এবং নতুন গঠিত শহরে বাঙালির ইংরেজিরা ইংরেজদের ব্যবসায়ের সঙ্গে মিশে অর্থোপার্জন শুরু করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পর বাংলার কৃষি নির্ভর জনজীবন বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে। কলকাতার কাচা পয়সার লোভে বাঙালির ভীড় বেড়েই চলেছে নতুন সৃষ্ট কলকাতার এই বাঙালি জনসমাজ রুচি, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পুষ্ট ছিলনা। এদের যে ধরনের রুচি তারই তাগিদে কবি গানের আসর জাগিয়ে বসেছে। যাত্রাগানে কৃষ্ণলীলা আধ্যাতিক রস হারিয়ে নিম্নরুচির পর্যায়ে নেমে গেছে। নতুন বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে চলেছে। এই নব গঠিত জনসমাজের কথা ভেবেই লেবেদফ বাংলায় নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা করলেন।[১৩]

পূর্বে লোকনাট্য যাত্রার অভিনয় হইত ধনীদের গৃহ প্রাঙ্গনে, মন্দিরের সামনে, বারোয়ারী তলায় কিংবা ব্যবসায়ীদের সমবেত চাদাঁর নির্ধারিত স্থানে।[১৪] সে সময় প্রত্যেক শ্রোতাকে অর্থের বিনিময়ে যাত্রাভিনয় উপভোগ করতে হত। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ শতকের শুরুতে মানুষের মধ্যে একটি পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন সমাজের মানুষে চিন্তা চেতনার জগতে এক ধরনের পরিবর্তন আনে। ফলে যাত্রা সে সময় ও সমাজের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারে নি। এ সময় যাত্রার বিষয়বস্তু ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে এই প্রথম দেশত্ববোধ ও মানবতায় উন্নীত হল। স্বদেশ যাত্রা পার্টির অধিকারি বরিশালের কৃতি সন্তান মুকুন্দ দাশ তার স্বরচিত সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বদেশি যাত্রাপালা পরিবেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জাগরণ এনেছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতিক স্থায়িত্বের জন্য স্বদেশি যাত্রা প্রচারের জন্য তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে একটি ও মেদিনিপুর জেলায় আরও একটি দল গঠন করেছিলেন, যা তৎকালীন বাঙালি সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত সংস্কৃতির ধারাকে সর্বজনের কাছে পরিচিত করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যাত্রার প্রাক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ড. তপন বাগচীর মত নিম্নরূপ:

> ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক সমাবেশ সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে। তৎকালীন সাহিত্যকর্ম বিশেষত অভিনয়ের মাধ্যম হিসেবে যাত্রা ও নাটকের সরাসরি প্রভাব রাজনৈতিক কাজের গতিবৃদ্ধি করেছিল যথেষ্ঠ পরিমাণে। তাই আন্দোলন দমনের অংশ হিসাবে বৃটিশ শাসকরা যাত্রা ও নাটকের প্রতি কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জনমনে চেতনা সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৮-১৯১২) নাটকের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। ১৮ জানুয়ারি ১৯১১ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রের তিনটি নাটক, 'ছত্রপতি' 'মীর কাসিম' 'সিরাজউদ্দৌলা' ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) দুটি নাটক 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭) ও নন্দ কুমার (১৯০৬) এবং আরো ছয়টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।[১৫]

বাঙালির প্রাচীন অভিনয় চেতনা যাত্রাপালার সঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। গবেষককেরা অনেকেই মনে করেন যাত্রাগানের প্রায় পাঁচ ধরনের আঙ্গিকের সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।[১৬]

যাত্রাদলের পালাকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা হিসেবে নজরুল ইসলামের সাক্ষাত পাওয়া যায়। ১১ বছর বয়সে তিনি লেটোগানের দলে যোগ দেন। এই লেটোগানকে যাত্রার জনপ্রিয় আঙ্গিক বলেও গবেষক মত দিয়েছেন।[১৭] প্রায় ১৪ বছর ধরে নজরুল ইসলাম লেটো গানের জন্য ১০ টি পালা রচনা করেন। এই দশটি পালার প্রত্যেকটির মধ্যে তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের স্বদেশি যাত্রার প্রাণপুরুষ মুকুন্দদাশের যাত্রাপালার জন্য নজরুল ইসলাম গান রচনা করার পাশাপাশি অভিনেতা হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনুপম হায়াত এর অভিমত আলোচনার দাবি রাখে। তিনি বলেন -

> মুকুন্দদাশ তাঁর যাত্রামঞ্চে নজরুলকে বিপ্লবী গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। নজরুল সে আমন্ত্রন রক্ষা করে কলকাতার কেয়া বাজারের বারোয়ারী তলায় যাত্রামঞ্চে আবির্ভূত হন। মুকুন্দ দাশের মতো গেরুয়া রঙের জামা পাগড়ী পড়ে। সেদিন বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে যাত্রামঞ্চে নজরুল উপস্থিত হয়ে গান গেয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলের তা বনর্ণনাতীত বলে পত্যক্ষদর্শীরা জানিয়ে লিখেছেন।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকে যাত্রাপালা বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এতোই প্রভাব ফেলেছিল যে, স্বয়ং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যাত্রার দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ধারণা করা হয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রাপালার ব্যাপক প্রভাবের কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নাটককের প্রস্তাবনায় পালা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

> আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে পালা সাঙ্গ হলে ভিক মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।[১৯]

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের পর যাত্রাপালার প্রভাব সমাজে এতো গভীরে প্রোথিত হয় যে , বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির সত্য স্বরুপ অনুধাবন করার কারণে যাত্রাপালা দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশের চলচিত্র অঙ্গন। ষাটের দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রাপালা 'রূপবান'। বাংলাদেশে রূপবান যাত্রাপালা অভিনয়ের জন্য প্রায় শতাধিক শখের যাত্রাদল বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠে। রূপবান যাত্রা তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে এতোই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল যে, এই জনপ্রিয়তার প্রভাব আমাদের চলচিত্রাঙ্গনকে স্পর্শ করেছিল। চলচিত্রে যাত্রাপালার আমদানি থেকেই অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে যাত্রার অবস্থান কতোটা সুউচ্চে পৌছেছিল। এ প্রসঙ্গে অনুপম হায়াত বলেছেন-

> ষাটের দশকের প্রারম্ভে উর্দুছবির প্রচণ্ড দাপটের মধ্যে পরিচালক সালাউদ্দিন তৈরি করেন 'রূপবান' (১৯৬৫)। ও সময় রূপবান যাত্রা বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। চিত্রকর্মী সফদার আলী ভূইয়ার অনুপ্রেরণায় সালাউদ্দিন রূপবান যাত্রাকে চলচিত্রায়িত করেন। ছবিটি সুপারহিট হয় যাত্রানাটকের মতোই। রূপবানের সাফল্যের অন্যান্য চিত্রনির্মাতাকে উর্দুভাষার বদলে লোকগাঁথা ভিত্তিক ছবি নির্মানে প্রেরণা দেয়।[২০]

যাত্রাপালা সামাজিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলেই কবি জসীম উদ্দীনের মতো খ্যাতিমান কবি ও সমকালে রূপবান যাত্রার উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কবি জসীম উদ্দীনের মতামত নিম্নরুপঃ

> কোন অজ্ঞাত রচনাকারী পূর্ব দেশের কোন অখ্যাত গ্রাম হতে এই রূপবান যাত্রার গান তৈয়ার করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানে ও তা জানিতে পারি নাই। কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক হইতে এমন সবৃজন সমাদৃত রচনা দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালি জাতির কোন লেখকই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পূর্ব দেশে এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে কোন না কোন প্রকারে এই রূপবান যাত্রার একটি দল নাই। এই গানের ভিতর দিয়া পূর্বদেশের

Dhaka University Institutional Repository

> সহস্র সহস্র অভিনেতা তৈরি হইয়াছে। তাহারা নানা গ্রাম ঘুরিয়া এই রূপবান যাত্রার রস বিতরণ করিতেছে। এই গান গ্রামোফোন কোম্পানি গত ছয় মাস আগে রেকর্ড করিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম গত কয়েক মাসে ৫০,০০০ রেকর্ড বিক্রি হইয়াছে। গ্রাম দেশের পথে ঘাটে বিচরণ করিলে পাঠক শুনিতে পাইবেন কোথাও না কোথাও হইতে কেহ না কেহ রূপবান যাত্রার গান গাহিয়া চলিয়াছে। একাধিক জায়গায় রূপবান যাত্রার অভিনয় দেখার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি ২০/২৫ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত সারারাত্র জাগিয়া এই গান উপভোগ করিয়াছে ইহাতে সহজেই অনুমান করা হইতে পারে এই গান বাঙালি শ্রোতার মনে কতোটা স্থান লাভ করিয়াছে।[২১]

তৎকালে যাত্রার প্রভাব সমাজে কতটা তীব্র ছিল তা কবির উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

অনেক গবেষক এমনও মত ব্যক্ত করেছেন যে, যাত্রাপালা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক কালে পূর্ববাংলা চিরায়ত সংস্কৃতির জাগরণ হচ্ছিল বলেই তৎকালীন সরকার যাত্রাপালার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যাত্রার সামাজিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে জসীমউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে যাত্রার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি বলেন -

> একে তো দেশের কৃষ্টি কালচারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি, তাহার উপর এই হয়রানি ও উচ্চহারে প্রমোদকর দেওয়ায় দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের অনুন্নত সমাজের সাময়িক ও নৈতিক প্রস্ফুটনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। উচ্চহারে প্রমোদকর আদায় করিয়াও প্রতি বছর ইহা হইতে অতি সামান্য আয় করিয়া থাকেন। গভর্নর সাহেবের নিকট আমাদের সনিবন্ধ অনুরোধ, অবিলম্বে দেশের এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইতে যেন প্রমোদকর রহিত করা হয়।[২২]

একাত্তরের পর যাত্রাপালায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ও সমাজের চিত্রকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের অনুস্মরনীয় আদর্শ হয়ে ওঠে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রায় শতাধিক যাত্রাপালা রচিত ও অভিনীত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির মূল আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে গবেষক তপণ বাগচী বলেন-

> শত্তরের দশকে অবশ্য ঐতিহাসিক যাত্রাপালা বিষয়বস্তুর দিক থেকে থিয়েটারের নাটককে পেছনে ফেলে এসেছে বলতেই হয়। শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয় , জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক পালা রচনা সাহসের পরিচয়বাহী।[২৩]

যাত্রাপালা সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বলেও আধুনিক কালে সবচেয়ে জনপ্রিয় জনমাধ্যম টেলিভিশনে অসংখ্য যাত্রাপালা অভিনয় সম্প্রচার করা হয়েছে। প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও গবেষক তপন বাগচীর মত উল্লেখ করা দরকার।

> দেশ অপেরার স্বত্তাধিকারী এবং বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সাধারন সম্পাদক মিলনকান্তি দে জানান-বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ পর্যন্ত প্রায় ছোট-বড় খ্যাত-অখ্যাত পেশাদার অপেশাদার বিভিন্ন দলের ৫৫ টি যাত্রাপালা প্রচারিত হয়েছে।[২৪]

যাত্রাপালা সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ অঙ্গে পরিবর্তনকে ধারণ করে বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির ধারাকে অব্যহত রেখেছে বলে সাহিত্যের জগতে ও যাত্রার স্থান রয়েছে। রবীন্দ্র নজরুল থেকে শুরু করে উত্তরাধুনিক কালের সাহিত্যিকদের মধ্যেও যাত্রার আবেদন লক্ষ করা গেছে। বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার উৎপল দত্তের অনেক নাটকের অভিনয়ে যাত্রা প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে। তাঁর 'টিনের তলোয়ার'[২৫] নাটকের অন্যতম লক্ষনীয় বিষয় ঐতিহ্য হিসেবে যাত্রার অবতারণা করেছেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে যাত্রার প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে উৎপল দত্ত নিজে অনেক যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। যাত্রাপলার সঙ্গে উৎপল দত্তের গভীর যোগাযোগ সম্পর্কে প্রভাতকুমার দাসের অভিমত উল্লেখ করলে সমাজে যাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বোঝা সহজ হবে।

তিনি বলেন-

> হিসেব অনুযায়ী উৎপল, ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৮- মোট কুড়ি বছর যাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সঠিকভাবে ধরলে তার শেষতম পালা আর্য অপেরায় 'দামাম ঐ বাজে' প্রযোজনার পূর্বে দীর্ঘ ছয় বছর তিনি চিতপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন। ১৯৮২ সালে রঞ্জন অপেরায় 'বিবিঘর' পালাই শেষতম পালা হতে পারত, কিন্তু আকস্মিক পুনরায় যাত্রায় তার আবির্ভাব ঘটল 'দামামা ঐ বাজে' পালায়। এর পরবর্তী পাঁচ বছর কাল, তার অকাল প্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কোন ভাবে তার যাত্রার সঙ্গে সংযোগ ঘটে নি। দীর্ঘ পনের বছর একটানা যাত্রার সংঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারা তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য পর্ব, এবং যাত্রাজগতের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি লড়াই করতে পেরেছিলেন দাপটপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জোরেই।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার যে প্রভাব লক্ষ করা যায় তা একান্তই কালানুক্রমিক। বাঙ্গালির সমাজ ও সংস্কৃতিতে যাত্রার সুদৃঢ় প্রভাব আছে বলেই কালে কালে যাত্রা বিবর্তিত হয়ে সমসাময়িক সমাজের মানুষের আবেদনকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত নিম্নরূপ:

> সাম্প্রতিক কালে যাত্রার পুনারাবির্ভাব হয়েছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা সম্পূর্ন পরিবর্তিত হয়েছে। এখন যাত্রার বিষয়বস্তু প্রধানত সামাজিক; সেজন্য এগুলোকে সামাজিক যাত্রাপালা বলা হয়। কোন কোন সময় অর্থনৈতিক বিষয় ও তার অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করেছে, সাম্প্রতিক যাত্রার মধ্যেও তার প্রভাব দেখা যায়। যাত্রা চিরকালই সমসাময়িক জন-রুচির অনুসরণ করেই বিকাশ লাভ করেছে। সাম্প্রতিক কালেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে আধ্যাত্মিক বিষয় এখনও কোন কোন সময় তার অবলম্বন হয়ে থাকে। আঙ্গিক দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দির প্রায় সকল উপকরণই তা থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের প্রভাব তাতে অনেক প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।[২৭]

বিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল যাত্রা নাট্যের মধ্যে একটি যুগ সত্য লক্ষ করা গেছে। এ প্রসঙ্গে ড: গৌরীশংকর ভট্টাচার্য বলেছেন,

> এখন যাত্রার বিষয়বস্তু খুব বিস্তৃতি ঘটেছে। পালার কাহিনী এখন চয়ন করা হচ্ছে বহিঃ ভারত থেকে; অর্থাৎ আফ্রিকা, চীন, ভিয়েতনাম জার্মানি, রাশিয়া রোম, ফরাসি প্রভৃতি দেশ থেকে; গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য এবং এলিজাবেথীয় নাট্যকাহীনি ও তা থেকে বাদ পড়ছে না। গ্লাডিয়েটরদের কাহিনী, ডিরোজিও, হিটলার, কার্লমার্কস এখনো যাত্রাপালার অন্তর্ভূক্ত। বিষয় বৈচিত্রের দিক থেকে যাত্রা যে এখনো থিয়েটার থেকে পিছিয়ে নেই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আন্তর্জাতিক ঘটনা, চিন্তা-চেতনা একালের পালাকারদের প্রভাবিত করেছে। তাই বর্তমানে পালাকারগণ পালার বিষয়বস্তুকে দেশ ও সমাজ সীমার বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে সমর্থ হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আসরে পৌরাণিক-ঐতিহাসিক যাত্রা পরিবেশিত হলেও এখন যাত্রায় সামাজিক পালারই প্রাধান্য।[২৮]

১৯৪৭ পরবর্তী বাঙলাদেশে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের ক্রম উন্নতির ধারা এবং গতি দুটোই ব্যহত হতে দেখা যায়। গবেষকেরা মনে করেন দেশ বিভাগের ফলে এদেশের বিখ্যাত যাত্রাভিনেতা ও পালাকারেরা রাষ্ট্রীয়-সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে দেশ ছেড়ে পশ্চিম বঙ্গে চলে যাওয়ার কারণে এই ব্যহত হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার যেভাবে যাত্রাশিল্পের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তাতে পেশাদার যাত্রাশিল্পীদের জীবনে চরম

Dhaka University Institutional Repository

হতাশা ও দুর্দিন নেমে আসে।[২৯] পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের মতো অসংখ্য অভিনেতা ও পালাকারেরা দেশ ত্যগ করার কারণে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প মুখ থুবড়ে পড়েলেও যাত্রাশিল্প তার পূর্ব গৌরবকে পূণরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক ধরনের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় বাংলাদেশের যাত্রাপালায় যে পরির্তন দেখা গেছে তা বেশ চোখে পড়ার মতো। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশান্ত সরকার বলেন–

> ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের ধারা এবং গতি দুটোই পরিবর্তিত হয়েছে। যে কালকে আমরা আপেক্ষিক অর্থে বলতে পারি যাত্রার একাল। যাত্রার আঙ্গিক ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মুক্তমঞ্চ নাটকের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। যাত্রার কাহিনীগত আবেদন দেশকে অতিক্রম করে আন্তদেশীয় রূপ লাভ করতে প্রয়াস পেয়েছে। ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক পালা মঞ্চায়নের প্রচণ্ড প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মধুসূদন, লেনিন, হিটলার, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইত্যাদি ব্যক্তিদের নিয়ে যাত্রামঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রকৃত যাত্রাপালার অভাব থেকেই গেছে।[৩০]

সিদ্ধান্তঃ যাত্রাপালা বাঙালির সুপ্রাচীন কালের লোকজ ও মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দীর্ঘকাল বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যাত্রাকে পথ চলতে হয়েছে। কালের বিবর্তনে পাশ্চাত্য নাট্যকলার প্রভাবে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য নানা বিষয় গ্রহণ ও বর্জনের ভেতর দিয়ে গিয়েও যাত্রা তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সমকালে আধুনিকতার দাবীকে স্বীকার করে নিয়েও যাত্রা তার স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে আজও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পটভূমিতে যাত্রাপালা সময়ের প্রতিবিম্ব হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই আধুনিক কালে যাত্রাপালায় অশ্লীলতার দায়ভার একালের যাত্রার উপর বর্তায় না। তবে বিশুদ্ধ ও ঐতিহ্য সচেতন যাত্রাপালা মঞ্চায়ণের মাধ্যমে এখনও যাত্রার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র:

১. মিলনকান্তি দে, *যাত্রাপালায় বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনগাথা*, দৈনিক যুগান্তর, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

২. প্রাগুক্ত,৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

৩. প্রাগুক্ত,৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

৪. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.২।

৫. তপন বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬. মিলনকান্তি দে, প্রাগুক্ত,

৭. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

৮. শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৯. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

১০. বৃন্দাবন দাশ, *শ্রীচৈতণ্য ভাগবত*, মধ্যখণ্ড, পৃ. ২৭৬।

১১. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৩. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০১, ঢাকা, পৃ. ২৬।

১৪. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩১।

১৬. অনুপম হায়াৎ (উদ্ধৃতি তপণ বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭)।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রক্তকরবী*, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা পৃ. ১।

১৮. অনুপম হায়াৎ (*উদ্ধৃতি তপণ বাগচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯)।

১৯. জসীম উদ্দীন, *আমাদের লোকনাট্য ও রূপবান যাত্রা, প্রবন্ধ*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

২০. অনুপম হায়াৎ (উদ্ধৃতি তপণ বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯)।

২১. জসীম উদ্দীন, প্রাগুক্ত।

২২. জসীম উদ্দীন, প্রাগুক্ত।

২৩. তপণ বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. উৎপল দত্ত, *টিনের তলোয়ার,* কলকাতা, পৃ. ১৯।

২৬. প্রভাতকুমার দাস, *যাত্রা:* উৎপল দত্তের, লোক সংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা।

২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৮. গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

২৯. মঈনউদ্দিন আহাম্মদ, *যাত্রার যাত্রা,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪২।

৩০. অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

যাত্রাপালার চরিত্রায়ণ কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

যাত্রাপালার চরিত্রায়ণ কৌশল

যে কোন নাট্যাঙ্গিকের মধ্যে আমরা এক বা একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করে থাকি। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালাতেও এক বা একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চরিত্র রূপায়নের পিছনে সক্রিয় থাকে পালাকারের চরিত্রায়ণ কৌশল। এ বিষয়টি বিবেচনা করলে লক্ষ করা যাবে যে মানব জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনা বা আবেগকে ধারণ করে চূড়ান্ত সাফল্যময় করে তোলার জন্য নাট্যকার বা পালাকার সময় ও সমাজের আবেগ ও অনুভূতির কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় চরিত্রসহ অন্যান্য চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে দর্শক শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহী করার কিছু কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। কেবল সার্থক বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রায়ণ কৌশলের মধ্যেই কোন একটি কাহিনীর সঠিক ও স্বার্থক নাট্যরূপ লাভ করে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের যাত্রায় অভিনয় অনুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন যাত্রানাট্যের অভিনেতা পাওয়া যায় এক থেকে তিনজন। একজন ব্যক্তিই আসরে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের অভিনয় গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। প্রাচীন যাত্রার অভিনয় অনেকটা বর্তমান কালের পালাগানের মতো গায়কী ঢঙের ছিল। আরও পরে কৃষ্ণ যাত্রায় আমরা তিন চরিত্রের সন্ধান পাই। এ প্রসঙ্গে নাট্য গবেষক তাজমিলুর রহমানের অভিমত নিম্নরূপ:

> বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও এই যাত্রা বা নাট্য-গীতের অন্তর্গত। দেবোৎসব বা যাত্রা এ জাতীয় নাটগীত বা যাত্রার মধ্যে যে তিনটি প্রধান ছিল, তা ছিল শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা এবং বড়াই। অনুমান করা যেতে পারে যে, এদের পাত্র পাত্রীর উক্তি মঞ্চে অভিনিত না হলেও নাটকীয় ভঙ্গিতে যে এসবের রূপদান করা হতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে প্রচলিত গীতগুলো সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পাত্র পাত্রীর এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে তাদের অঙ্গভঙ্গি গুলো নতুন যাত্রার পূর্ব লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[১]

প্রাচীন যাত্রার চরিত্রায়ণের ব্যাপারে তৎকালীন পালাকারেরা রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্রের মধ্যে বড়াইকে প্রধান চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন । অনেকাংশে তা সফলও হয়েছেন ।

> দ্বাদশ থেকে পঞ্চাদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ জয়দেবে গীত গোবিন্দ থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত রাধাঁ কৃষ্ণের লৌকিক প্রণয় লীলা আখ্যান ভিত্তিক। এই কাব্যের বিষয়বস্তু যতোটা না কাব্যিক তার চেয়ে ও বেশি নাটক। যেহেতু অনেক গবেষক গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যাত্রার প্রাথমিক রুপ বলে মনে করেছেন। তাই এই পালা

Dhaka University Institutional Repository

> দুটির চরিত্রায়ণের ব্যাপারে গানকে প্রাধান্য দিলেন। কারণ তখন বাঙালি গীতিনির্ভর সংস্কৃতি লালন করত। যে কোনো সাহিত্যের চরিত্রায়ণ কৌশল নির্ভর করে তার কালিক চাহিদার উপর।[২]

ঠিক একই কারণে ঊনিশ শতকের যাত্রার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে যাত্রানাট্যের পালাকারেরা ধর্মীয় আবহের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, তাই ঊনিশ শতকের যাত্রাপালাতেও চরিত্র হিসেবে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। অভিনয় প্রসঙ্গে চরিত্র কেবল ব্যক্তির প্রতিবিম্ব নয়; নাট্যকারের নাটকের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে বিকশিত করাও নয় বরং যাত্রাপালার চরিত্র একটি বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতিক আদর্শের প্রতীকও বটে। ঊনবিংশ শতকে যাত্রা কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখের প্রচেষ্টায় যাত্রা একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ লাভ করার পিছনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক চাহিদার স্বরূপ প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩] চরিত্রায়ণের কারণেই কৃষ্ণকমলের যাত্রাপালায় শ্রীকৃষ্ণ দেবত্ব পরিহার করে মানবত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এ কারণে সমকালে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রা ঢাকার মানুষকে নতুন পরিসরে আনন্দদানে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর চরিত্রায়ণ কৌশল এত উচ্চমানের ছিল যে, চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তির পরিবর্তে একটি কাল এসে দর্শকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেত। কৃষ্ণকমলের যাত্রার চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত নিম্নরূপঃ

> বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্নবিলাস সার্থক হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি নাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, স্বপ্ন বিলাস প্রভৃতি কাব্য প্রবীণ চৈতন্য চরিতামৃত মহীরূহের ফুল ও ফল।[৪]

শিল্প মাত্রই সময়ের দাবিকে স্বীকার করে। যে শিল্প সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করে তা কখনই জনমনে স্থান করে নিতে পারে না। সময়ের দাবিকে স্বীকার করেই রশিকলাল চক্রবর্তী তার যাত্রাদলে এখানে বালক চরিত্র সংযোজন করে কালের দাবি পূরণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুরেশ চন্দ্র মৈত্র বলেনঃ

> যশোহর জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায় গ্রামের অধিবাসী রসিকলাল ১২২৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৯৪ সালে মাতৃবিয়োগের পরে তিনি হরিগুণ গানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদল বালক লইয়া একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলটি 'বালক সংগীত যাত্রা' নামে খ্যাত হয়। এক সময় বাংলার সর্বত্রই এই বালক সংগীতের আদর ও সম্মান বাড়িয়াছিল। এই বালকগণ পীতবস্ত্র পরিয়া, মাথায় ফুলের কেয়ারবী দিয়া রাখাল সাজিত। এই কৃষ্ণযাত্রার রসিকলাল বক্তৃতার পরিবর্তে লোকরঞ্জনের জন্য ছড়া ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে এই যাত্রা কতটা অপেরার আকার ধারণ করে। রসিকলাল 'নিমাই সন্ন্যাস', কংসবধ,

Dhaka University Institutional Repository

'মায়ের ছেলে' প্রভৃতি পালার গাওনা করিতেন। তিনি চমৎকার গান বাঁধিতে পারিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত্ত হইল–

দেখরে জ্ঞান চুক্ষু মেলে সেকি কালীদহে ডুবাল ছেলে।
বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে (ও মন)
আছে পঞ্চভুতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলেস্থলে
ঐ দেখ কান্তি আভা নীলময় নভোমশন্ডলে (ওমন)
ঐ দেখ কৃষ্ণ রূপের প্রভা পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দুর্বাদলে।
নব ঘন শ্যামের বর্ণ দেখরে ঐ নীরদ জলে,
(ও মন) সে যে অন্তরে বাহিরে দেখে ভাসে রসিক নয়ন জলে।[৫]

উনিশ শতকের যাত্রাপালায় প্রথম নারী চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিনয় মহিলা দ্বারা করার ব্যপারটি চরিত্রায়ণ কৌশলের অংশ বলেই অনেক গবেষক মনে করেছেন। যাত্রা পালায় প্রথম নারীর দ্বারা নারী চরিত্রে অভিনয় কেবল নিছক বিনোদন নই, এই নারীর দ্বারা নারী চরিত্র অভিনয়ের মধ্যে নারী স্বাধীনতার বীজ লুকাইত আছে। নারীদের যাত্রাভিনয় শুধু অভিনয় নয় বরং সামাজিক বিপ্লব বলে অনেক গবেষক মত দিয়েছেন। কারণ যাত্রাপালায় নারী প্রবেশ শুধু অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী যাত্রাদলের অধিকার যাত্রাদলে অধিকারীও হয়েছিলেন।

প্রখ্যাত যাত্রাকর মদন মাস্টারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার দল পরিচালনা করেন। নবীনের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী কৈলাসকামিনী দেবী এই দলের অধিকারী হইলেন। কালী ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতা দল পরিচালনা করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় সুগায়ক ও সুঅভিনেতা ছিলেন। দলটি 'বৌমাস্টারের দল' নামে খ্যাত হয়। এই দলে ধ্রুব চরিত্রে, প্রভাবযজ্ঞ, দণ্ডীপর্ব, হরিশ্চন্দ্র, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি পালার সঙ্গে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' 'সতীনাটক' ও 'হরিচন্দ্র' পালা অভিনীত হইত। উনিশ শতকের শেষে বৌমাস্টারের দল খুব সুনামের অধিকারী হয়। চন্দননগরে বৌমাস্টারর নামে একটি রাস্তা চিহ্নিত রহিয়াছে। এই রাস্তার নাম বৌমাস্টারের গলি।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

ঊনিশ শতকের যাত্রার চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে সে সময়ের মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক রুচির মানদণ্ডকেও নিরুপণ করার চেষ্টা করেছেন। ঐ সময়ে যাত্রানাট্য এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, স্বয়ং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেও শখের যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য উদ্ধৃত হল–

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চরিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে– একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মুর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে।[৭]

বিংশ শতকের শুরুতে আমরা যাত্রাপালায় নতুন বিষয় ও চরিত্রের সন্ধান পেলাম। এ সময়ে যাত্রার বিষয় ও চরিত্ররা শুধু ধর্মীয় স্তুতিমূলক অভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলা না। বিশ শতকের যুগ চেতনা এই সময়ের যাত্রা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হল। এ সময় বঙ্গভঙ্গের প্রভাব আমরা যাত্রা অভিনয়ের মধ্যে নতুন চরিত্রের স্বরূপে প্রকাশিত হল। যাত্রার চরিত্ররা ব্যক্তিগত চেতনা ও ধর্ম চেতনার বাইরে গিয়ে আন্দোলন ও স্বদেশ চেতনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ সময় ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রত্যাপদিত্য (১৯০৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রানা প্রতাপ সিংহ' সমেধার পতন, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা, (১৯০৬) প্রভৃতি নাটক যেমন শহরে স্বদেশ প্রেরণা দিয়েছিল।[৮]

ঠিক একইভাবে মুকুন্দদাশের যাত্রা পল্লীগ্রামে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। মুকুন্দ দাশের যাত্রার চরিত্ররা ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়িয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। যাত্রা গবেষক তপন বাগচী বলেন-

> বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলন সকল স্তরের মানুষকেই স্পর্শ করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসৈনিক বরিশালের মনীষী অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চারণ কবি মুকুন্দ এলেন যাত্রা নিয়ে। তার যাত্রা জনচিত্তকে জয়তো করলই। ব্রিটিশ শাসকের ভিত্তি নড়িয়ে দিল। একে একে নিষিদ্ধ হল মুকুন্দ দাসের ৪টি যাত্রাপালা ও দুটি গানের বই। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য থাকায় তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

মুকুন্দ দাশের যাত্রার চরিত্রের কণ্ঠস্বর এতো বেশি স্বদেশ চেতনা ধারণ করেছিল যে তৎকালের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও যাত্রাপালার আত্মশক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। মুকুন্দ দাশের যাত্রার চরিত্রদের শক্তি সম্পর্কে একজন গবেষক বলেছেন -

> মুকুন্দ প্রতিভার বিকাশে দুজন ব্যক্তির প্রেরণা ও সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। একজন তাঁর স্বদেশিকতার গুরু অশ্বিনী কুমার দত্ত আর বন্ধু কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কবির রচিত বহু গান গেয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুকুন্দদাশের গানের প্রভাব সে কেবল কোন অঞ্চলে সাময়িক ভাবোচ্ছাসের প্লাবন সৃষ্টি করে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। একথা সেদিন কেবল যে অশ্বিনী কুমার বুঝেছিলেন তা নয়। দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র তা বুঝেছিলেন। এজন্য তারাও মুকুন্দ দাশকে গানে গানে সমগ্র দেশকে মাতিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই সেদিনের সেই আন্দোলন বিক্ষুব্ধ বাংলা দেশের বন্ধন মোচনের জন্য দুর্জয় কর্মোদ্দম এবং আত্মশক্তিতে আস্থাশীল হয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে দিলেন দেশপ্রেমিক মুকুন্দ দাশ। [১০]

যাত্রানাট্যের জগতে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে একটি অবিস্মরণীয় নাম। যাত্রানাটকে এক যেয়েমি গীতি প্রবণতা থেকে প্রকৃত নাট্যগুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি প্রায় পঞ্চাশের অধিক যাত্রাপালা রচনা করেন। তাঁর পালায় যে সমস্ত চরিত্রের সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন তাতে যাত্রাপালা শুধু ধর্মীয় ও পৌরাণিক চরিত্র মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। তার পালার চরিত্রায়ণ সম্পর্কে যাত্রা গবেষক তপন বাগচী বলেন–

> ব্রজেন্দ্রকুমারের বড় গুণ এই যে, সামাজিক পালায় তো বটেই, তিনি পৌরাণিক কিংবা কাল্পনিক পালায় ও শিক্ষনীয় বক্তব্য উপস্থাপণ করেছেন। তাঁর পালার বক্তব্যে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তিনি মায়া (১৯২৭) পালার মাধ্যমে পণ প্রথার প্রতিবাদ করেছেন। প্রবীরার্জ্জুন (১৯৩২) পালাটি পৌরাণিক হলে পাণ্ডবদের সাম্রাজ্যবাদী বলার মাধ্যমে তিনি সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। 'লীলাবসান' পালায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কন করে শ্রেণিচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'রাজনন্দিনী' (১৯৪২) এবং 'সমাজের বলী' পালায় অস্পৃশ্যতাবিরোধী বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে।[১১]

জিতেন্দ্র বসাক, সেকেন্দার আলী, মতিউর রহমান আসির উদ্দিন (১৯২৫-২০০৬), সত্যপ্রকাশ দত্ত (জ.১৯২৬), কফিল উদ্দিন আহম্মদ (১৯২৭-১৯৮৭০) নির্মল মুখোপাধ্যায় (জ.১৯৩২) চিত্তরঞ্জন পাল, আরশাদ আলী প্রমুখের যাত্রাপালা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আলোড়ন তৈরি করে। তাদের যাত্রাপালার চরিত্ররা বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজের মানুষের মনস্তত্ত্বকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাপালার নাম 'রূপবান'।

Dhaka University Institutional Repository

'রূপবান' যাত্রাপালা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে গ্রামের সাধারণ জনগণের মাঝে এ যাত্রাপালা কিংবদন্তি হয়ে আছে। 'রূপবান' যাত্রাপালার এতো বেশি জনপ্রিয়তার কারণ হল এর চরিত্রায়ণ কৌশল। বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষেই নারীর সতীত্ব বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। বাঙালি সমাজের নারীর আদর্শ হল সতী, সাবিত্রি, সীতা, বেহুলার মত পতিভক্ত নারী।[১২] যাত্রাপালার পালাকারেরা তাঁদের যাত্রানাট্যের নারী চরিত্রগুলোকে সতীত্বের পরীক্ষায় দারুণভাবে উত্তীর্ণ করিয়েছেন। যে অসাধ্য কাজ সমাজের পুরুষ পারে নি তা যাত্রানাট্যের নারীরা পেরেছে।

'রূপবান' যাত্রার রূপবান চরিত্রের মধ্যে আত্মত্যাগের মহিমাই রূপবানকে মহিয়সী নারী রূপে প্রতিষ্ঠায় তার চারিত্রিক মাধুর্যকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তুলেছিল। আর সতীত্বের পরীক্ষায় সতী-সাবিত্রিকেও হার মানিয়েছে এই রূপবান কন্যা। আকাব্বার বাদশার বারদিনের শিশু পুত্রকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে বাসর রাতেই শিশু পতিকে নিয়ে বার বছরের জন্য রূপবান একাকী বনবাসে চলে যায়। পথের মধ্যে শত বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে সতী মেয়ে রূপবান তার শিশু পতিকে বাঁচাতে অনেক পরীক্ষা দেওয়ার পর স্বামীর জীবন রক্ষা করে। আকাব্বার বাদশা এতবড় প্রতাপশালী রাজা হয়ে যা পারেনি, বার বছরের মেয়ে রূপবান তা করতে পেরেছে। রূপবান চরিত্রের সার্থকতা নিহিত রয়েছে ত্যাগের মহিমায়। রূপবানের মহিমার কাছে আকাব্বার কিংবা সায়েদ বাদশার প্রভাব ও প্রতাপ একবোরেই ম্লান হয়ে গেছে।

কোন একটি কাহিনীকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নাট্যকার ঐ সমাজের সংস্কৃতির স্বরূপের দিকে লক্ষ রেখেই তার চরিত্রায়ণের কৌশলটি অবলম্বন করে। বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান বিবেচনা করেই নাট্যকার রূপবান চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। নাট্যকারের নাট্যিক অভিপ্রায়ের কারণেই রূপবান চরিত্রের মাহাত্ম সমৃদ্ধির জন্যই অন্য সব চরিত্রকে কিছুটা ম্লান করে রূপবানকে মহিয়সী নারী রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এ কারণেই যাত্রাপালার 'রূপবান' নামকরণ অত্যন্ত সার্থক হয়েছে।

আকাব্বার বাদশার বার দিনের শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য বাদশা বার বছরের কন্যা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছেন মন্ত্রীকে, কিন্তু নিজ কন্যা রূপবানের বয়স বার বছর হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী তা বাদশার কাছে প্রকাশ করেন নি। এমনকি পুরো রাজ্যে কোন প্রজাও বার দিনের শিশুর সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে চায় নি। অবশেষে বাদশা রাজ্যের ব্রাহ্মণের সহায়তায় জানতে পারে তাঁর প্রাসাদেই আছে বার বছরের যুবতী এবং সেই কন্যা হল স্বয়ং উজির সাহেবের কন্যা মা রূপবান। বাদশা উজির কে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি বারদিনের শিশুর সঙ্গে তার একমাত্র কন্যার বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। এমতাবস্থায় বাদশা নিরূপায় হয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলেন। ঘোষণা করলেন উজিরের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদণ্ড। রাজ্যের জল্লাদ মন্ত্রীকে বদ্যভূমিতে নিয়ে গেল হত্যা করার জন্য। ঘটক দাদুর মুখে পিতার মৃত্যুদণ্ডাদেশের কথা শুনে দৌড়ে গেল রূপবান বদ্যভূমিতে। দূর থেকে দেখতে পেল তার পিতা খড়গের নিচে মাথা রেখে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। জল্লাদ খড়গ উঠিয়ে যখন উজির কে হত্যা করতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রূপবান খড়গের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে নিজ যৌবন বিসজর্ন দিয়ে পিতার জীবন রক্ষা করল। পালাকারের ভাষায়–

রূপবান– (দূর থেকে) না...! একি করছ জল্লাদ ভাই! তুমি খান্ত হও জল্লাদ ভাই, খান্ত হও।

উজির– (বিস্মিত হয়ে) মা রূপবান, মা আমার, তুই এখানে কেন এসেছিস? পালিয়ে যা মা, তুই এ রাজ্য ছেড়ে অনেক দূরে পালিয়ে যা। (কান্না)

রূপবান– আমার জন্মদাতা প্রাণের আব্বাকে জল্লাদের তরবারীর নিচে রেখে আমি পালিয়ে যাব? তুমি চল পিতা আমরা দুজনে এক সাথে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই।

বাদশা – কোথায় পালাবে তোমরা? তোমার কাজ তুমি এক্ষণি সমাপ্ত কর জল্লাদ। হত্যা কর এই বেঈমান মন্ত্রীকে।[১৩]

বাদশাকে দেখেই রূপবান জিজ্ঞাসা করতে লাগল কেন এবং কী দোষে তার পিতাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। গানের মাধ্যমে রূপবানে জিজ্ঞাসায় দর্শকের হৃদয়কে বিমোহিত করে।

রূপবান– (গান)

শোনেন শোনেন শোনেন বাদশা গো,

ও বাদশা বলিযে আপনারে গো

শোনেন বাদশা বাদশা গো।

কি অপরাধ করছে পিতা গো

ও বাদশা তাই বলেন আমারে গো,

আমার বাদশা, বাদশা গো।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাও এই সময়ে রূপবানের কাছে তাঁর রহিমের অকাল মৃত্যুর কথা ব্যক্ত করে স্বয়ং রূপবানের কাছে রহিমের প্রাণ রক্ষা করার জন্য আবেদন করলেন। একদিকে পিতার জীবন রক্ষা অন্যদিকে বাদশার শিশুপুত্রের জীবন রক্ষার জন্য বিয়েতে রাজি হয়ে গেল।

> বাদশা–(কান্না জড়িত কণ্ঠে) মা রূপবান। আমার একমাত্র নয়নের মণি, বাবা রহিমকে তুমিই বাঁচাতে পার। তুমি যদি আমার রহিমকে বিবাহ করতে রাজি হও, তাহলে আমি স্বসম্মানে তোমার পিতাকে মুক্তি দিয়ে আবার আমার বুকে টেনে নেব। বল মা তুমি চুপ করে থেকো না। আমি বাবা হয়ে তোমার কাছে হাত জোড় করে আমার রহিমের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি মা, তুমি আমার রহিমকে রক্ষা কর।
>
> উজির– খবরদার মা! আমার জীবন গেলেও এ বিয়েতে তুই রাজি হস না।
>
> রূপবান– (কাঁদতে কাঁদতে) জাহাপনা। আপনার ছেলে রহিম বাদশাকে আমি স্বামী বলে কবুল করলাম। এবার দয়া করে আমার পিতাকে মুক্তি দিন।
>
> বাদশা– মা রূপবান, তুমি আমার তাপিত হৃদয় শীতল করে দিলে মা। এই কে আছিস? উজির সাহেবের হাতের বন্ধন খুলে দে। আর দুঃখ নয়, চল ভাই উজির আমরা বিয়ের আয়োজন করি।[১৫]

রূপবান চরিত্রের মধ্যেই পালাকার সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি আরোপিত করে কাহিনীকে গতিময় করে তুলেছেন। এ জন্য পদে পদে রূপবানকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর এ কারণেই রাতের অন্ধকারে স্বামীকে নিয়ে রূপবান বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশের পথে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখার পর আর এক মুহূর্তের জন্য রূপবান প্রাসাদে অবস্থান করে নি। পিতা-মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বনবাসের পথে পা বাড়ায়।

> রূপবান– মা, বাবা আমি ঘুমের ঘরে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কে যেন আমায় ডেকে বলল নতুন পথে যেতে। তিনি বললেন, আমি যদি না যাই তাহলে আমার স্বামীর অকল্যাণ হবে। আমাকে এক্ষনি প্রসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে মা, তা না হলে আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারব না। (কান্না)
>
> বাদশা– মা রূপবান, এ যে মুনির অভিশাপ। এই রাতেই তোমাকে বার বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে মা, তা না হলে আমার রহিমের অকল্যাণ হবে। হ্যাঁ মা সত্যিই তোমাকে নতুন পথে যেতে হবে। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই মা। মা রূপবান তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য তোমাকে ঐ পথ অনুস্মরণ করতেই হবে। তা না হলে তোমার স্বামীর অকাল মৃত্যু হবে।

Dhaka University Institutional Repository

রূপবান– না..। অমন কথা বলবেন না বাবা আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করব। আমি এক্ষনি আমার স্বামীকে নিয়ে এ প্রাসাদ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। আপনি আমাকে আশির্বাদ করুন পিতা। মা আমাদের বিদায় দাও। (কান্না)[১৬]

রূপবান চরিত্রের চরিত্রায়ণ পরিকল্পনায় পালাকার বাঙালি নারীর চিরকালীন মাতৃময়ী রূপকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

সাগরভাসা যাত্রাপালাতেও আমরা নারীর মাতৃময়ী রূপের পরিচয় পাই। অত্যাচারী রনজিত রাজার শত অত্যাচার সহ্য করেও সত্যবতী তার সন্তান সাগর ভাসাকে জন্ম দেন। কারাগারে জন্ম নেওয়া সাগরকে যখন ধাত্রী তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তখন সত্যবতীর আর্তনাদে আকাশ- পাতাল ব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। সত্যবতী চরিত্র চিত্রায়ণেও পালাকারের ভীষণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যবতী– হায় ভগবান, জানি না আমার বাছার কপালে কী আছে। ওরে আমার নয়নের মনি, আজ তোকে পেয়ে আমার জীবনের সকল কষ্ট আমি ভুলে গেছি। তুই কি আমায় মা বলে ডাকবি না বাবা?

ধাত্রী– না সত্যবতী, তোর ছেলে তোকে মা বলে ডাকার সুযোগ পাবে না। মহারাজের আদেশে আমি এক্ষণি তোর ছেলেকে তোর বুক থেকে নিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তাহলে তোর ছেলেকে আমার হাতে তুলে দে পাপিয়সী।

সত্যবতী– কী বললে ধাত্রী! আমার বাছাধনকে আমি আমার বক্ষে রাখতে পারব না? উঃ ভগবান! এই কি তুমি আমার কপালে লিখেছিলে? বল ভগবান আমি কী পাপ করেছি? যার জন্য তুমি আমাকে এমন কঠিন শাস্তি দিচ্ছ। বল ভগবান বল। আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি ধাত্রী এমন পাপের কাজ তুমি কর না।

ধাত্রী– না আমি তোর কোন কথাই শুনব না। মহারাজের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।(বাচ্চা কেড়ে নিল)

সত্যবতী – কেমন করে তুমি আমার বুক শূণ্য করে ওকে নিয়ে যাবে ধাত্রী, তোমার প্রাণে কি দয়া-মায়া নেই? আমার বুক থেকে তুমি আমার মানিককে কেড়ে নিলে? সন্তানের মায়া কি তোমার হৃদয়ে নেই? আমার সন্তান কে তুমি আমার বুকে ফিরিয়ে দাও। (কান্না)[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

গুনাই বিবি যাত্রাপালাতেও নারী চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে পালাকার পূর্ববর্তী পালাকারদের পথই অনুস্মরণ করেছেন। গুনাই বিবি যাত্রাপালায় সমস্ত পালার ট্রাজেডি বহন করেছে গুনাই। চাচা দুলু মিয়ার চক্রান্তে তোতা মিয়া জেলে গিয়েই তার ভূমিকা শেষ । কিন্তু নাট্যাকারের অভিপ্রায়ই হল কেন্দ্রীয় চরিত্র গুনাইয়ের ট্রাজেডি পরিণতি ঘটিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা । গুনাই বিবি পালাতেও নারী চরিত্রের মহাত্ম প্রকাশ পেয়েছে। আপন ভাইয়ের ছেলে তোতা মিয়াকে জেলে পাঠিয়ে গুনাইকে দুলু মিয়া যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয় তখনই স্বতীনারী গুনাই বলে ওঠে-

গান

ও কি চাচা জান আপনি কুকুরের সন্তান,

ভাইয়ের ছেলে জেলে রেখে আমায় নিকা করতে চান।

ওকি চাচাজী আপনি নিকা করবেন নি ।

ঘরে আছে আপনার মেয়ে ।

আপনার মারে করবেন নি ।[১৮]

গুনাই বিবি চরিত্রের এধরনের কথা শুনে দুলুখার অস্তিত্বে আঘাত লাগে। সে প্রতি হিংসার আগুনে জলে ওঠে এবং গুনাই বিবিকে বলেন-

> দুলু-খামোশ নারী! আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এস আমার বক্ষে এসো। এখনই তোমাকে আমার বক্ষে চেপে ধরে একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলি । এস, এস সুন্দরী হাঃ হাঃ হাঃ ...।
>
> গুনাই-না না আমাকে ছেড়ে দে পশু। আমাকে ছেড়ে দে। (চিৎকার) কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর এই নরপশুর হাত থেকে ।
>
> রহমান- সাবধান লম্পট ওকে ছেড়ে দে । নইলে আমার হাতের পিস্তলের গুলি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে । তুমি চলে যাও বোন । আজ থেকে আমি তোমার ভাই তুমি আমার বোন ।
>
> গুনাই- তাই যাচ্ছি ভাইজান, তবে যাবার আগে তোমাকে জানাই শ্রদ্ধার সালাম। (প্রস্থান) [১৯]

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাপালার নাম "দেবী সুলতানা"। দেবী সুলতানা যাত্রাপালার দেবীর চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও পালাকার দেবীর মধ্য দিয়ে নারীর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলমান ধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । পুরো ভারতবর্ষে যখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে হাজীমোল্লা সরাবের নির্মম অত্যাচারের জবাব দেয়ার জন্য উদয় নারায়ণের কন্যা হয়েও দেবি মুর্শিদাবাদে গিয়ে মুর্শিদ কুলিনের ভুল ভাঙ্গিয়ে ধর্মান্ধতা দূর করতে সক্ষম হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাঁকে পতিতা ঘোষণা করে। এর ফলে দেবী আবার মুর্শিদাবাদে চলে যায়। যে ধূর্জটিমঙ্গল দেবীকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতো শুধু ধর্মান্ধতার কারণে ও সমাজের ভয়ে তিনিও দেবীকে প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের ধর্মান্ধতা দূর করার জন্য মুসলমানের পক্ষ নিয়ে নিজ প্রেমের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর নেতৃত্বে মুর্শিদকুলী খানের বাহিনী দিনাজপুরে রাজা উদয়নারায়ণের প্রাসাদ আক্রমন করেন। ধূর্জটিমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে অলখ্যেই দেবীর হাতে ধূর্যটিমঙ্গলের মৃত্যু হয়।

পালাকার সুরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়–

আলীবর্দ্দী খা–হা : হাঃ হাঃ

দেবী–শয়তান আলীবর্দী খা!

উদয়– নবাবের নফর আপগান শয়তান আলীবর্দী কি মজা দেখতে এসেছো ।

আলীবর্দী–আরে জিম্মি রাজা উদয় নারায়নকে গ্রেপ্তার করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যেতে এসেছি ।

দেবী– না, মহারাজ যাবেন না তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ।

আলীবর্দী–নবাবকা দাওয়াই খেলে বিলকুল সুস্থ হয়ে উঠবে।

দেবী–থামো জানোয়ার ।

আলীবর্দি–চুপরাও হোসনি ।

উদয়–কী বললি জানোয়ার আমার প্রাসাদে ঢুকে আমারই সামনে আমার মেয়ে আপমান করলী? তোকে আজ আমি নিজ হাতে খুন করে সেই আপরাধের প্রতিশোধ নেব। (আসু...অজ্ঞান)

রানী– ওরে কে আছিস রাজ বৈদ্যকে ডাক ।[২০]

তখন দেবী বুঝতে পারে যে, রাজ বেদ্য তাঁর বাবাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে না। একমাত্র সেই জানে তাঁর বাবার এ রোগ আসলেনিজের আত্মমর্যাদা হানির গভীর ক্ষত ছাড়া আর কিছুই না। তাই তিনি বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

দেবী–না, রাজ বৈদকে নয়।

রানী –দেবী!

দেবী– রাজ বৈদ্য বাবার এ রোগ সারাতে পারবে না । এ ভীষন রোগ যার আর এক নাম সাপের ছোবল।

রানী – সাপের ছোবল ।

দেবী – হ্যাঁ সাপের ছোবল ।

দেবী – হ্যাঁ সাপের ছোবল। ঘরে ঘরে জলছে আগুনের হলা হল। সাপের উগরে দেয়া অতীব্য হলা হল, সে বাংলার আকাশ বাতাসকে বিষজ্ঞ করে তুলছে। সেই মহা কালনাগের ফেনা মুছড়ে ধরতে আমি চলমান মুর্শিদাবাদ।

রানী – দেবী ।

দেবী– বাঁধা দিওনা মা। বাধাঁ দিয়োনা মন্দিরে জাগ্রত কুলদেবতা পায়ের তলায় বসুন্ধরা । মাথার উপরে চন্দ্র সূর্য , গ্রহ তারাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি । কালনাগের বিষদাত ভেঙ্গে দিয়ে আমি তাকে চিরতরে নির্বিষ করে দেব। আর না পারি সেই বিষের চিতায় তোমাদের দেবীর হবে জীবলীলা সমাপ্তি । জীবন আহুতি'[২১]

রূপবান যাত্রার চরিত্রায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনজীবনের উপযোগী করে সকল চরিত্রকে রূপদান ও নির্মাণের কৌশল । এ যাত্রাপালায় চরিত্রগুলির গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই যে, চরিত্রগুলো মহত্ত্বের রূপদান করেছে এমন একটি মত দিয়েছেন কবি জসীম উদ্দীন। যাত্রার চরিত্রায়ণ কৌশল প্রসঙ্গে পল্লী কবি জসীম উদ্দীন বলেন :

রূপবান যাত্রার চরিত্রগুলোর মুখে এই গান দুটি শুনিয়া আমার মনে হয়েছিল, এতদিন যে পল্লীগান লইয়া সাধনা কারয়াছি তাহা যেন স্বার্থক হইল। যাদের লক্ষ্য করিয়া গান রচনা করিয়াছিলাম তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত রূপবান যাত্রার বিভিন্ন চরিত্রের মুখে প্রচলিত বহু গ্রাম্য গান জুড়িয়া দিয়া এই লোকনাটকের রচনাকার তাহার শ্রোতাদের মধ্যে যে ভাবরসের সমাবেশ করেন তাহা শহরে অভিনীত উচ্চাঙ্গ নাটকে দেখা যায় না। এ যেন যুগ যুগান্তরের বাঙালি জাতির প্রাণ রসটিকে আহরন করিয়া শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া। একদল মোল্লাপন্থী সমালোচক নাকি বলিয়া থাকেন, এই নাটকে ইসলামের আদর্শ ক্ষুন্ন করা

Dhaka University Institutional Repository

হইয়াছে। কোথায় হইয়াছে তাহা কেহ প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। এই নাটকের ঘটনাটি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করলে পাঠক লক্ষ করিবেন এই নাটকের প্রথম হইতে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত কেবলই দু:খের পর দু:খ।[২২]

'রূপবান' যাত্রার চরিত্রায়ণে পালাকার শ্রোতা দর্শকদের মনের কথাকে তার চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। গ্রামীণ সমাজের ও গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে নিয়ে অলঙ্কারিত করেছেন। গ্রামীন লোকাচার বিবাহ সাধারণ মাঝিদের কথোপকথন প্রভৃতি লোকায়িত। দৃশ্য যাত্রা পালায় সংযোজন করে রূপবান সহ সকল চরিত্রকে শিল্প মূল্যের উৎকর্ষতা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে জসীম উদ্দীনের অভিমত নিম্নরূপঃ

রূপবান আসিয়া নৌকার মাঝিকে বলিতেছে-

রূপবান–মাঝি ভাই আমাকে পার করে দাও।

মাঝি– পার করনের জন্যই তো বসিয়া আছি।

রূপবান –আমারতো কোন ধন রত্ন নাই। আমাকে দয়া করে পার করে দাও ।

মাঝি–হগল যাগায় পয়সা দিবার পার কেবল পার ঘাটায় আইসা দয়া । তেল কিনবার পার পয়সা দিয়া , কেবল পার হইবার আইলিই পয়সা জোটে না। ক্যা আমাগো মাগ–ছাওয়াল নাই?

পোলা পাইন নাই। তাগো খাওয়ানো লাগে না। আমাগো কি পেটে ক্ষুদা নাই ?

এই দৃশ্যে এরূপ বহু কথা আছে তার পর পোদ্দারের চরিত্রের অবতারণা।

এই লোকনাট্যের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে সংলাপ ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কোথাও পৃষ্ঠাব্যাপী এক যেয়ে উচ্ছ্বাস নাই। কাহার কথায় উপমা অলংকার, বা বক্তৃতার বাহুল্য নাই। একে বারে নিত্ত–নৈমিত্তিক জীবনে মানুষ যেভাবে কথা বলে, এই নাটকের নট-নটীরা যেভাবে কথা-বার্তা বলিতেছে এই সাধারণ কথায় রস সৃষ্টি করা খুবই শক্তির পরিচায়ক। রূপবান যাত্রার লেখক তার নট-নটীদের মুখে এই সাধারণ কথা জুড়িয়া দিয়াই অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়াছেন । তাহার রচনা সার্থক হইয়াছে।[২৩]

যাত্রাপালার গুরুত্বপূর্ন চরিত্র হল বিবেক।[২৪] অনাড়ম্বার বিবেক চরিত্র ন্যায়ের প্রতীক। কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভবিতব্য ও পরিণাম সম্পর্কে বিবেকের আগাম বার্তা যাত্রা নাট্যের গতিকে যেমন ত্বরান্বিত করে তেমনই চরিত্রের পরিণাম সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। বিবেক চরিত্র সম্পর্কে শ্রীমন্তকুমার জানা মনে করেন, যাত্রার বিবেক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েই

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাটকে ঐধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা যাত্রা সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন-

> রবীন্দ্র সঙ্গীতে যাত্রার বিবেকী সুরের মিলন যে, প্রত্যক্ষ প্রভাব জনিত তা নয় । এটি মূলত : দীর্ঘ কালের জাতীয় ঐতিহ্যের একটি ধারা । রবীন্দ্র প্রতিভায় একাকার হয়ে স্বাঙ্গীকৃত কয়েকটি রবীন্দ্র নাটকে যাত্রার বিবেক চরিত্রের সমধর্মী চরিত্রের পরিচয় মিলে।' প্রায়শ্চিত্ত ' (১৯০৯) ও মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী , 'রাজা'র (১৯১০) ঠাকুরদা এবং 'অচলায়তন' এর (১৯১২) দাদাঠাকুরের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যাত্রা মূলতঃ নীতিমূলক-ন্যায় ধর্মের আদর্শকেই যাত্রায় সু-প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা অন্যায় তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাকে কেউ রোধ করতে পারে না- এই হচ্ছে ধর্মপ্রাণ বাঙালি তথা ভারতীয়দের বিশ্বাস। যাত্রার কেন্দ্রবর্তী এই আদর্শের বাহক বিবেক। বিবেক সরল অনাড়ম্বর চরিত্রের লোক-কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা সংগ্রামী যোদ্ধা। ধনঞ্জয় বৈরাগী তাই যাত্রার বিবেক চরিত্রের সমতুল্য।[২৫]

যাত্রার বিবেক চরিত্রের সংযোজন যাত্রানাট্যের জনপ্রিয়তাকে অনেক উচ্চে নিয়ে গিয়েছে। বিবেক সাধারণত ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। তার কণ্ঠের গান সব সময় ন্যায়ের বার্তা বহন করে। এ প্রসঙ্গে মুত্তালিব বিশ্বাস বলেনঃ

> যাত্রা শিল্পের বিবেক চরিত্র এক অপূর্ব উদ্ভাবন প্রয়োগ–কুশলতার এক অনন্য নিদর্শন। সে প্রয়োগ বড়ই মনস্তত্ত্ব সম্মত। যাত্রার বিবেক মনুষ্য বিবেকেরই প্রতিনিধির পরিবর্তিত রূপ। একটা মানুষ সে যেই হোক আর যত মন্দ স্বভাবেরই হোক তার ভিতরেও একটা শুদ্ধ সত্তা বাস করে। সেই সত্তার ভিতরে বসে মানুষ যখন প্রয়োজন, মানুষের মনে শুভ শক্তি যোগায়, অশুভ শক্তিকে দূর করার জন্য। মানুষ যখন দিকভ্রান্ত হয়, শুভাশুভ নির্ণয়ের শক্তি হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় তখন তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে এই বিবেক। এক হিসাবে ভেবে দেখলে বুঝতে বাকি থাকেনা যে, যাত্রার বিবেক প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন চরিত্র নয় সে বিশেষ চরিত্রেব শুদ্ধসত্তার প্রতিরূপ মাত্র।[২৬]

যাত্রাপালার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে বিবেক চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ড. ক্ষেত্রগুপ্তের অভিমত নিম্নরূপ-

> পুরনো ধরণের যাত্রা-উপকরণের মধ্যে বিবেক চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। অতখানি ভূমিকা না থাকলেও 'নিয়তির' ভূমিকাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরনো নিমাই সন্ন্যাস যাত্রাপালার অভিনয়ে পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা দেখেছি, নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে চলে যাবার মুহূর্তে একটি মহমায়া চরিত্র নৃত্যগীতসহ গমনেচ্ছুক নিমাইকে যেন বাধা দিতে চাইছে। সংসার মায়াকে এখানে মহমায়া বলা হয়েছে। নিমাইয়ের সময়োচিত

Dhaka University Institutional Repository

> গানটি যাই যাই মনে করি চলিতে না পারি, মহমায়া আমার পিছনে ধায়। যেন যাত্রাওয়ালা নিমাইয়ের মধ্যে সন্ন্যাস ও সংসারিক আকর্ষণের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের কল্পনা করেছিলেন। তার জন্য পালাকারেরা সন্ন্যাস মহিমার কথা ভাবেন নি, সহজ মানবিক রসই তাদের কাছে ছিল বেশি সত্য। এখানে মহমায়ার যে ভূমিকা তা নাটকীয় উপস্থাপনার দিক থেকে বেশ গুরুত্বপুর্ণ। এই ধরণের দায়িত্ব যাত্রাপালাতে প্রায়ই বহন করেছে 'বিবেক, নামের একটি চরিত্র। [২৭]

যাত্রার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সমসাময়িক বিষয়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যাত্রাপালায় নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় বিবেক চরিত্র এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন বলে গবেষকেরা মত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বদিউর রহমান বলেন–

> চরিত্র সৃষ্টিতে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ যাত্রানাটকের সূচনা পর্ব থেকেই লক্ষ করা যায়। ন্যায়ধর্ম পথ নির্দেশক, কর্তব্যপরায়নতা কিংবা কারুর মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য চরণ-চারণ, ফকির, পাগল, বাউল প্রভৃতি বিবেক জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি যাত্রাপালায় আজও আছে। কালের বিবর্তনে বিবেক চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে বটে কিন্তু যাত্রায় বিবেকের উপস্থিতি যেন অপরিহার্য। [২৮]

যাত্রাপালায় দর্শক–শ্রোতাদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য লঘু চরিত্রের উপস্থিতি যাত্রাপালার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে পালাকারেরা এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করছেন। এসকল কমিডিয়ান চরিত্ররা কেবল নাটকের একঘেয়েমী দূর করেনি বরং কেন্দ্রীয় চরিত্রের চারিত্রিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবেও কাজ করেছে। 'রূপবান' যাত্রাপালায় রহিম ও তাজেলের সহপাঠী হিসেবে পেটুকচান ও খালেকের [২৯] উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে এক ধরণের হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পালাকারের ভাষায়-

> পেটুকচান– আল্লারে আমি এ কোন জায়গায় বৈলামরে আল্লা, চেয়ারে বসে) এই তাজেল দেখতো আমারে মাস্টার সাবে মত মনে হইতেছে কিনা। তুই আমার পাডারে একটু লড়ায়ে দে দেখি তাজেল।
>
> তাজেল– দেখ পেটুকচান পাগলামী করবিতো বাবাকে নালিশ করব। তখন দেখবি বাদশার শাস্তি কত কঠিন।
>
> পেটুকচান– আমি কিছু কইলেই শুধু নালিশ করবার চাস, রহিম কইলে তো কিছু কস না। সেকি তোর মানে ইয়ে নাকি? আমি সব জানি রহিমের সাথে তোমার ইটিস-পিটিসের কথা আমিও তোমার বাবার কাছে বলে দেব।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তঃ যাত্রাপালার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে পালাকারেরা দর্শক-শ্রোতাদের বুদ্ধিমত্তার কথা মাথায় রেখেই সরল বিষয়বস্তু ও সাধারণ জীবনোপোকরণকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে গ্রামীণ জনজীবনে যাত্রাপালা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান হিসেবেই জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিল। শুধু চরিত্রায়ণ কৌশলের সরলীকরণের জন্যই যাত্রাপালার সমসাময়িক জীবন অনিবার্যভাবে ধরা দিয়েছে। রাজা-বাদশার কাহিনীকে অনায়াসেই তাদের নিজের মত করে মনের মধ্যে স্থান করে নেওয়ার অন্যতম কারণ হল এর সরল চরিত্রায়ণ কৌশল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১. তাজমিলুর রহমান, *যাত্রার ইতিবৃত্ত*, সৈকত আজগর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

২. অধ্যাপক সুশান্ত সরকার, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

৪. নিত্যানন্দ গোস্বামী সংকলিত, *কৃষ্ণকোমল গীতিকাব্য*, দীনেশচনাদ্র সেন লিখিত ভূমিকা।

৫. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩১।

৬. প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৪।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলে বেলা, পৃ. ২১।

৮. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭২।

৯. তপন বাগচী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

১২. মোঃ সামসুল হক, রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা, চতুর্থ সংস্ককরণ, ১৯৯৫, পৃ, ২৩।

১৩. প্রাগুক্ত, ২৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৭. মোঃ সামসুল হক, *সাগরভাসা*, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ, ৪১।

১৮. আবুল কালাম, *গুনাই বিবি*, চতুর্থ সংস্ককরণ, ২০০৮, পৃ, ৩৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২০. সুরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, *দেবী সুলতানা*, ইউ টিউব।

২১. প্রাগুক্ত

২২. জসীম উদ্দীন, প্রাগুক্ত পৃ. ৮৭।

২৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৯০।

২৪. সুনীল দত্ত, *সেকালের নাট্যচর্চা*, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৩০, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৫.শ্রীমন্ত কুমার জানা, *রবীন্দ্র-মনন*, কলিকাতা, ১৯৬৯।

২৬.মুত্তালিব বিশ্বাস, *জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯২-৯৩।

২৭.ক্ষেত্রগুপ্ত, *যাত্রার বিবেক-থিয়েটারে বিবেক এবং কিঞ্চিত নিয়তি*, সৈকত আজগর) পৃ, ৩৭৫।

২৮.বদিউর রহমান, *বাংলা লোকসংস্কৃতির ধারাঃ যাত্রা*, *নান্দনিক*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

২৯.মোঃ সামসুল হক, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৯।

৩০.প্রাগুক্ত পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল

অভিনয় কৌশল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিনয়শিল্পী বাস্তব জীবনে তার চরিত্রের মতো অভিনয় করে।[১] জীবনাচারণে ঠিক সেই ধরনের আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অভিনেতা তার চরিত্রে অভিনয়ের সময় বাস্তব জীবনধর্মী অভিনয় ফুটিয়ে তোলেন। শুধুমাত্র অভিনয় নৈপূণ্যের বলেই অভিনেতা চরিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, এখন সে আর ব্যক্তি থাকে না পুরোটাই চরিত্র হয়ে যাওয়ার কারণে তারা নিজেরা অভিনয় করেন না বরং তারা নিজেরা এই চরিত্র হয়ে যান। আর এ কারণে অভিনেতাকে অভিনেতা মনে না হয়ে ঐ চরিত্রই মনে হয়। দক্ষ অভিনয় কৌশলের ফলেই অভিনেতা নিজেই ঐ চরিত্র হয়ে যান। ব্যক্তি তখন নিজের আচরণ ভুলে গিয়ে ঐ চরিত্রের মতই আচরণ করতে থাকেন। লোকনাট্য যাত্রাপালার অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি চরিত্র সমাজের কোনো একটি বিষয় ব' চরিত্রের অভিনয় কালে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যার কারণে শ্রোতা অভিনেতাকে ভুলে এমন এক সত্যের জগতে পৌছে যান তখন তার কাছে অভিনেতার অভিনয়কে বাস্তব বলে মনে হয়। অভিনেতা যদি সঠিক কৌশল অবলম্বন করে চরিত্রের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে তবে শ্রোতা দর্শকের কাছে সে অভিনয়কে বাস্তব জগতের কর্মকান্ড বলে এক ধরনের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। ঠিক এ কারণেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ে দেখার সময় বাস্তব জ্ঞন বিবর্জিত হয়ে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিও জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন। যাত্রাপালা যেহেতু লোকনাট্য, তাই যাত্রাপালার অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যের কারণেই গ্রামীণ জনপদে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। অভিনয় যদি বাস্তবতা বর্জিত হয় তাহলে তা দর্শকের দৃষ্টিতে ক্রুটি হিসাবেই ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য গবেষক ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত নিম্নরূপঃ

> অতিতে যাত্রাভিনয়ের একটি মারাত্মক ক্রুটি ছিল। এই ক্রুটি ইহার অশ্লীলতা ও ভাড়ামি। পালাভিনয়ের প্রধান বিষয়বস্তুর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে এই সব অশ্লীল ভাড়ামির কোন সম্পর্ক থাকিত না। শুধু দর্শক মন্ডলীকে হাসাবার জন্য, হালকা আনন্দ দেবার জন্য এসব নিকৃষ্ট চরিত্রের অবতারণা করা হইত। কখনো কখনো পালারম্ভের প্রথমে বাসদেব ও কাসদেব আসিয়া সঙ দিত; দিত দেবর্ষি নারদের সঙ্গে। কখনো কোনো কোনো পালায় 'কালুয়া-ভুলুয়া' আসিয়া অশ্লীল ভাষায় ভাড়ামি করত। এই সব ভাড়ামির কোন নির্দিষ্ট বিষয় থাকিত না। এই সব অধম চরিত্রের মুখে যা আসিত তাই বলিত। নাট্যাভিনয়ের অন্তর্গত এই অশ্লীলতা বাঙালির

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় চরিত্রের নৈতিক অবনতির পরিচয়। ক্রমে প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাভিনয়ের এই সব অনাবশ্যক অঙ্গের বিলোপ ঘটে অভিনয় অশ্লীলতা মুক্ত হয়।[২]

যাত্রাভিনয়ের দোষ ত্রুটি আলোচনা করতে গিয়ে ড. পবিত্র সরকার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার বিশ্লেষণ থেকে এমন একটি ধারণা পাওয়া যায় যে শত দোষ থাকা সত্বেও শুধু অভিনয় নৈপুণ্যের কারণেই যাত্রা বাঙালির মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন:

> গীতাভিনয়ের সরণি বেয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাত্রা যেখানে এসে পৌঁছেছে তা অবিমিশ্র মেলোড্রামার পৃথিবী এ যাত্রার সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার ঐতিহাসিক ছাড়া আর কোন যোগ নেই। এখানে যাত্রা জনপ্রিয়তার স্থায়ীতম ও ধ্রুব ভিত্তিটি লাভ করেছে। অট্টহাস্য, পদাঘাত, 'রে রে রে পাষণ্ড' গোছের সম্ভাষণ, অভিনয় ও সংলাপে অত্যুক্তি ইত্যাদি যাত্রার স্থায়ী অংশ হয়ে আমাদের চিন্তায় আসন নিয়েছে।[৩]

যাত্রাপালা অভিনয়ে অভিনেতারা কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যে মত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

> রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর যেরূপ অভিনয় কৌশল প্রয়োজন, অভিনীত চরিত্রের রূপ-সজ্জা তার চরিত ফল প্রয়োজনীয় নয়। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয়ের ভাব প্রকাশের পূর্বে তার রূপ দর্শকদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। যদি রূপসজ্জার অভিনেতা দক্ষ হন বা তার সেই সজ্জা তার চরিত্রানুযায়ী হয় তা হলে দর্শকদের অভিনয়ের দ্বারা মোহিত করবার বহু পূর্বের রূপদক্ষ অভিনেতা দর্শকদের হৃদয় অনেকখানি জয় করে নেয়। যাত্রাপালার একজন অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রে একই রাত্রে অভিনয় করে থাকেন তার অভিনয় দক্ষতার কারণে।[৪]

অভিনয় কুশলতাকে পরিবর্তিত সমাজের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যাত্রাপালা অভিনয় অন্যান্য নাট্যাঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন–

> আধুনিক যাত্রার একটি শাখা যেমন রঙ্গমঞ্চ এবং চলচিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তেমনি আর একটি শাখা ইহার প্রাচীন ধারাটি যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ ও চলচিত্রের প্রভাবকে স্বীকার করিয়াই যাত্রার সর্বনাশ যে অনিবার্য হইয়া উঠিবে, তাহা আজ অনেক যাত্রাশিল্পীই বুঝিতে পারিয়াছে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যাত্রার অভিনয় কৌশল সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিমত নিম্নরূপঃ

> প্রাচীন যাত্রার মধ্যে ক্রমশঃ নাটকীয় আবেদন, সংলাপ প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগলো। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপরিণত সংলাপের কিছু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে গীতিসুরে হলেও প্রথম উত্তর প্রত্যুত্তর করতে দেখতে পাওয়া গেল।[৬]

যাত্রাপালার অভিনয়রীতি ও কৌশলের পরিবর্তন সম্পর্কে জিয়া হায়দারের মতামত নিম্নরূপঃ

> কালের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ফলিত শিল্পকর্মের রীতি ও বৈশিষ্ট্যের অগ্রগতিরও পরিবর্তন ঘটে, যাত্রা ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যাত্রার উপস্থাপনায় মঞ্চরীতির ক্ষেত্রে বৃত্তাকার পদ্ধতিই বহাল রয়ে গেছে। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত যাত্রাভিনয় বা পালাগানে কোন দেবতাকে অবলম্বন করা হত বলেই প্রধানত মন্দিরে নাট মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হত। বহু মন্দিরে উঁচু মণ্ডপ ছিল এবং রয়েছে। যাত্রাভিনয় হল উঁচু মঞ্চ বা সমতল ভূমি যেকোন ভাবে সেখানকার ব্যবস্থাও সুবিধা অনুসারে হত। যাত্রার মূল অভিনয় স্থানের চার পাশেই দর্শকদের বসার রীতি; যাত্রার কাহিনী সংগীতিক উপস্থাপনার মধ্যেই প্রকাশিত হত। সেকারণে যাত্রা ও পালাগান সমার্থক। চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত যাত্রার কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও বর্ণনাসমূহে অভিনেতা বা গায়েন উপস্থিত করত।[৭]

যাত্রাপালা তথা গীতাভিনয়ের ধারা বা অভিনয় কৌশল সম্পর্কে ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি যাত্রার অভিনয়শৈলী সম্পর্কে কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) অতিরিক্ত গীতের প্রাধান্য।

(খ) সংলাপের ছড়ার অতিরিক্ত ব্যবহার।

(গ) পরিচিত কাহিনীর সরলতম প্রকাশ।

(ঘ) সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবৃতি মূলক।

(ঙ) কাহিনীর মধ্যে যেমন বহির্দ্বন্দ্ব নাই, চরিত্রগুলোর মধ্যেও দ্বন্দ্বের অভাব, চরিত্রের সক্রিয়তার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় মনোভাব।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রার অভিনয় কৌশল সম্পর্কে নাট্য গবেষক নাজমূল আলমের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

> আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ে উল্লেখিত রীতি প্রচলিত। পূর্বেও এবং বর্তমানেও যাত্রার আবহসঙ্গীত ও গান রাগাশ্রয়ী হয়ে থাকে। তবে কিছু লোকসঙ্গীতও অনুপ্রবেশ করেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে।[৯]

শ্রীমন্ত কুমার জানা যাত্রার অভিনয়রীতি সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করা হলোঃ

> যাত্রার সংলাপ, নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে হাস্য, করুণ, বীর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের উপস্থাপনা ঘটে। যাত্রার মঞ্চসজ্জা থাকেনা বলে সংলাপের গুরুত্ব বেশি। পরিবেশ, পরিস্থিতি, চরিত্র ও ঘটনা সমস্ত কিছু সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিবেক চরিত্র-অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চকিত সতর্কবাণী এবং নিপীড়িতের জন্য সান্ত্বনা ও আশ্বাস ঘটনার গতি বিভিন্ন মুখে ফিরিয়ে দেয় । বিবেক চরিত্রের সংগীত যাত্রার নৈতিকতার আদর্শকে প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে।[১০]

যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে মঞ্চ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক অন্যান্য নাট্যাঙ্গিক থেকে যাত্রানাট্যের মঞ্চ পরিকল্পনা ভিন্ন ধরনের। এ প্রসঙ্গে শ্রীমন্তকুমার জানার একটি অভিমত আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তিনি বলেন-

> যাত্রায় মঞ্চসজ্জা থাকে না থাকে একটা আসর। আর সেই আসরকে ঘিরে থাকে চারিদিকে শ্রোতা। থিয়েটার মঞ্চের সঙ্গে যাত্রার এখানেই বিরাট পার্থক্য। থিয়েটার মঞ্চে থাকার জন্য শ্রোতা ও অভিনেতাদের মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যায়। যাত্রার আসর জনগণ ও অভিনয় মিশিয়ে সামগ্রিক সৃষ্টি করে। থিয়েটারে স্থান-কাল-পাত্র নির্দিষ্ট করে দেখানো হয় দৃশ্যপটের সাহায্যে। যাত্রার অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা ঘটনা, পরিবেশ, ও চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। যাত্রা তাই অভিনয় বা সংলাপ সর্বস্ব। সংলাপ শ্রোতার মনে অফুরান্ত কল্পনা জাগ্রত করে।[১১]

যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে হয়। যাত্রাভিনয়ে গম্ভীর, জোরালো ও উচ্চ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজনীয় কৌশল বলেই বিবেচনা করা হয়। কোনো প্রকার পশ্চাৎভূমি না থাকায় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই আলো-অন্ধকারের পরিবেশ পরিস্থিতি অভিনেতাকে তার অভিনয় কৌশলের দ্বারা তৈরি করে নিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য গবেষক অজিৎ কুমার ঘোষ বলেন-

> যাত্রার পশ্চাৎভূমি নেই বলে আলোর চাতুর্য দেখানোর সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। যাত্রার আসর ও দর্শকস্থান পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় আলোকে উজ্জ্বল রাখা দরকার। শুধুমাত্র দূরের দর্শকদের কাছে অভিব্যক্তি দৃশ্যমান করার জন্য স্পষ্ট লাইটের ব্যবহার করা হয়। যাত্রাভিনয়, মঞ্চাভিনয় ও চরিত্রাভিনয়ের রীতি আলাদা আলাদা। যাত্রাভিনয়ে গলা গম্ভীর, জোরালো ও উচ্চ হওয়া দরকার। ভঙ্গি ও পদক্ষেপের গুরুত্ব যাত্রায় অনেক বেশি। কণ্ঠসঞ্চালনে বৈচিত্র ও উচ্চাবাচ্চ রূপ বজায় রাখতে হয়। যাত্রার রূপসজ্জাও মোটামুটি সাদামাটা হয়।[১২]

নাট্য গবেষক প্রভাত কুমার দাসও যাত্রানাট্যের অভিনয় কৌশলের বিষয়টি আলোচনার ব্যাপারে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বিশিষ্ট অভিনেতা উৎপল দত্তের যাত্রাভিনয়ে কৌশল আলোচনা কালে এরকম একটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়-

> যাত্রার অভিনয় রীতিতে বাচিক ও কায়িক, অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণে সাবলীল ওঠা-নামা, উচ্চকণ্ঠ দ্রুতভাষা সংলাপ কথন কিংবা শরীর-অভিনয়ে অতি নাটকীয় ভাবভঙ্গি বা কসরতের প্রবণতা, যেগুলি যাত্রাভিনয়ে দর্শক সমাজে 'আর্ট' হিসেবে চিহ্নিত হয়। উৎপল দত্ত তাঁর পালাভিনয়ে এসব ব্যবহার করেছিলেন সংযত রূপান্তরে, এক অনায়াস সাফল্য।[১৩]

যাত্রানাট্যের অভিনয়ে বিনোদন মূখ্য রূপে কাজ করলেও তার ভিতর দিয়ে নীতি, আদর্শ এবং সামাজিক শিক্ষার উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়। অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য আধুনিক মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি আড়ম্বর যাত্রায় ব্যবহৃত হয় না বলেই যাত্রাশিল্পীদের আরও বেশি কুশলী হতে হয়। শুধু অভিনয় নৈপুণ্যের কারণেই যাত্রাশিল্প এদেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক রুচি শিক্ষার বাহন হিসেবে অদ্যাবধি কাজ করে আসছে। অভিনয়ে জনসম্পৃক্ততা থাকার কারণেই যাত্রাপালা গুরুত্বপুর্ণ জনমাধ্যমে পরিণত রূপ লাভ করেছে। ভাষা ব্যবহারে যাত্রাপালা অভিনয় মাধ্যমগুলোর মধ্যে বেশ কৃতিত্বের দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে নাট্য গবেষক নাজমূল আহ্সান বলেন-

> যাত্রাভিনয়ের সব চাইতে আকর্ষণীয় উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল তার ভাষা। কাব্যপূর্ণ ভাষাটা ছন্দময় ও এমন যাদুকরী যে, যে কোন বাণী অতি শক্তিশালীভাবে প্রক্ষেপণ করতে পারে। ভাষার কাব্যময় তীক্ষ্ণতা

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রখরতার জন্য তা জনপ্রিয়। যাত্রার গদ্য-পদ্য উভয় সংলাপই একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যাত্রার অতি নাটকীয় বিস্ফোরণের প্রাচুর্য রয়েছে এবং সে কারণে তার সাহিত্যিক মর্যাদাও বর্ধিত হয়েছে।[১৪]

যাত্রাভিনয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর মঞ্চ নির্মাণ কৌশল। মঞ্চের প্রবেশ-প্রস্থান, গ্রিনরুম ইত্যাদি বিষয়গুলোও অভিনয় অনুসঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের খ্যাতিমান যাত্রা অভিনেতা ও প্রাবন্ধিক মোহসিন হোসাইনের মতটি উল্লেখ করা হল:

> সেই প্রাচীনকাল থেকে যাত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হল দর্শক ও শ্রোতাদের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে অভিনয় উপস্থাপণ করা। অভিনয় স্থানটি অবশ্যই একটি বর্গাকৃতির হতে হবে। আগের দিনের মঞ্চেও দুখানা জল চৌকি রেখেই অভিনয়ের কাজ চলতো। পরবর্তীকালে জল চৌকির স্থলে এলো দুখানা চেয়ার। ঐ দুটো জলচৌকি কিংবা চেয়ারকে কেন্দ্র করে যাত্রার রাজা-রাণী, ভাড়-কৌতুক সবারই অভিনয়ের কাজ সমাধা হতো। এক সময় দূরবর্তী দর্শকদের সুবিধার জন্য মঞ্চটি উঁচু করে দেওয়া হলো। এই উঁচু করার কাজে মাটি ব্যবহার করা হতো- পরবর্তীকালে মাটির স্থানে বাঁশের মাচাং কিংবা চৌকি বিছানো হয়। এইভাবে তৈরি হত মঞ্চ বা স্টেজ। স্টেজের সঙ্গে একটি সরুপথ মাটি দিয়ে তৈরি করার নিয়ম আজও আছে। এই পথ দিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা মঞ্চে গমনাগমন করেন। অভিনয় স্টেজের দুই পার্শে যাত্রীদলের অবস্থানের জন্য মঞ্চ থেকে একটু নিচে দুই ফালি মঞ্চ তৈরী করার নিয়ম আছে।[১৫]

যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল বাংলাদেশে কতোটা জনপ্রিয় ছিল সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যাভিনয়ে যাত্রাপালার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করলেই যাত্রানাট্যের অভিনয় কৌশলকে খুব সহজে অনুধাবন করা যাবে। বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল আত্মিকরণশক্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিভন্ন ধারা রবীন্দ্র প্রতিভায় এসে একাকার হয়ে গেছে। বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাসাহিত্য সম্পর্কে কোন চিন্তা তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল কি না এবং যাত্রাসাহিত্যের ভাব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র নাট্যচিন্তায় কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমার মতে রবীন্দ্র নাটকে ভদ্রসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। আর বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালার কেন্দ্রগত ভাববস্তুও একইভাবে দ্বৈতসত্তার চূড়ান্ত আত্মিকরণ বলেই তার গ্রহণযোগ্যতা শিক্ষিত সমাজ ও গ্রাম্য সমাজে অনাদিকাল থেকে অদ্যাবধি আবেদনময় হয়ে আছে। বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালাই বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন নাট্যাঙ্গিক এ ব্যাপারটি সর্বপ্রথম অনুধাবন করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত নাটকগুলোর আঙ্গিক গঠন, চরিত্রায়ণ কৌশল, মঞ্চায়ণ ও মঞ্চসজ্জার সময় তিনি ইউরোপীয় ও ইংরেজ নাট্যকৌশলকে পুরোপুরি বর্জন করে বাংলার মৃত্তিকা সংলগ্ন

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালার আদলকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বাংলায় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম একটি স্বাধীন নাট্যমঞ্চের স্বপ্ন দেখে ছিলেন। অন্যদিকে নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থের ভূমিকা ইত্যাদি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালার প্রতি গভীর দৃষ্টি আকর্ষণের সাথে সাথে আধুনিক ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তিনি বলেছেন–

> আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভুলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তার রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির কাছে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তার কছে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালাকেই তিনি বাংলাদেশ ভূখণ্ডের আদি ও আসল লোকনাট্যের আঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন–

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চরিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে– একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মুর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যবিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ ও নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় উপরিউক্ত মতের স্বপক্ষে বারংবার জোরালো মত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও আধুনিক কালের বাঙালি নাট্যকারদের নাটকের সঙ্গে তাঁর নাটকের বৈসাদৃশ্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর একারণে সমকালে তাঁর নাটককে অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব সমকালে যাত্রাপালা বলে ব্যঙ্গও করে ছিলেন। যুক্তি স্বরূপ সমালোচকেরা গানের বাহূল্য, নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা, অভিনয়ে যাত্রাপালার আঙ্গিক প্রয়োগ, ফকির, সন্ন্যাসী, পাগল, বাউল, বৈরাগী, প্রমূখ চরিত্রের প্রাধান্য মূলত যত্রাপালারই মার্জিত প্রয়োগ বলে মনে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাপালার অভিনয় কৌশল রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি নিজের নাটকের অভিনয় কৌশল নির্ধারণ করলেন যাত্রাপালার অনুরূপ। যাত্রাপালার সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের সম্পর্কের তুলনা করার প্রয়াসের অন্যতম কারণ তিনি নিজেই তাঁর অনেক নাটককে পালা বলে উল্লেখ করেছেন। 'রক্তকরবী'র 'প্রস্তাবনায় তিনি এ নাটককে 'নন্দিনীর পালা' বলেছেন। ১৩৩১ সালে লিখিত কবির অভিভাষণ উল্লেখ করলেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার অন্তগুঢ় ভাব যাত্রাপালার সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তা সহজেই অনুমান করা যাবে।

তাঁর নাট্যচিন্তার প্রকৃতি বোঝার জন্য নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

> আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে পালা সাঙ্গ হলে ভিক মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।[১৮]

রবীন্দ্র নাট্যচিন্তায় যাত্রানাট্যের প্রভাব কতটা গভীর তা এ শিরোনাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো আলোচনা পাওয়া গেছে তার সব গুলোতেই তাঁর একটি বিশেষ নাট্যগুণ আলোচনায় আনা হয় না। সেটি হল এ পর্যন্ত শিক্ষিত সাহিত্য সমাজে বাংলা নাটকের যতগুলো আঙ্গিক লক্ষ করা গেছে তার কোনোটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যাঙ্গিকের তেমন উল্লেখযোগ্য মিল পরিলক্ষিত হয়না। নিরীক্ষাপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল রচনার ক্ষেত্রেই নতুনত্বের অবতারণ ঘটানোর ব্যাপারে সর্বোদা সচেতন থেকেছেন। নাটকের ব্যাপারে এ বিষয়টি শুরু থেকেই স্বাধীন এবং বাঙালির মূলাশ্রয়ী হয়ে থাকতে চেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন।

আমরা গবেষকদের মাধ্যমে জানতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচিত 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতি' ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) এই তিনটি নাটকের জন্য বেশ কটি গান রচনা করে দিয়ে তৎকালে প্রচলিত নাট্য ধারায় পরিবর্তন আনতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিলেন। আর নাটক রচনার পূর্বেই তিনি নাটকে গান সংযোজনের দ্বারা বাংলার চিরায়ত লোকনাট্য যাত্রাপালার জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর রচিত প্রথম নাটকেই আমরা লোকনাট্য যাত্রাপালার প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। একই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতীয় চরিত্রের চেয়ে লৌকিক উপাদানের ঘটনার প্রতিও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে পোক্ত ভিত্তি প্রমাণের জন্য শ্রী সুকুমার সেনের সমকালীন মনোভাবনা উল্লেখ করা যেতে পারে–

> বাল্মীকি-প্রতিভায় গীতিনাট্যের নূতন রূপ দেখা গেল। গান এখানে সংলাপের প্রতিধ্বনি নয়। গান ও সংলাপ মিলিয়া নাট্যরস জমাইয়াছে।..., বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনায় রামায়ণ হইতে আর কোন কাহিনী গৃহীত হয় নাই। তবে কোনো কোনো গানে ও কবিতায় অহল্যার কাহিনী উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত আছে।[১৯]

যাত্রানাট্যের সংলাপ যেখানে গানে পূণর্ব্যক্ত সাহিত্যিক মহলে ও শিক্ষিত মহলের কাছে বাহুল্যদোষ বলে বিবেচিত হতো, রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' যেন দোষমুক্ত নতুন যাত্রার আদর্শ হয়ে উঠল। নাট্যজীবনের শুরুতেই তিনি স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছিলেন। ইউরোপীয় নাট্যাঙ্গিককে শৈশব থেকে বর্জন করার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী'ও 'মায়ার খেলা', নাটকেও তিনি গান নিয়ে নানাভাবে নিরীক্ষা চালিয়েছেন যা লোকনাট্য যাত্রাপালার আধুনিক সংস্করণ বলেই অনেকে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন-

> বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া, যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি ন্যাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। মায়ার খেলার সমাদর প্রথম অভিনয় হইতেই (জানুয়ারি ১৮৮৯)। গানের ও সুরের গীতিনাট্যের আকর্ষণ অটুট আছে।[২০]

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে রামায়ণ, মহাভারতীয় উপকরণ নিয়ে রচিত এ সকল নাটকের সাথে লোকনাট্য যাত্রাপালার সম্পর্ক কোথায়? এক্ষেত্রে একটু গভীরভাবে ভাবার অবকাশ আছে বৈকি। তিনি এসকল নাটকে যে সমস্ত চরিত্র-পাত্র গ্রহণ করেছেন, সে সকল চরিত্র মূলত যাত্রাপালার চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর নাটক যাত্রার বিষয়বৈচিত্র ও ভব বেচিত্র সমৃদ্ধ। রবীন্দ্র নাটকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের সার্বিক বিষয়কে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন তেমনি রামায়ণ, মহাভারত,পুরাণ, বৈষ্ণবসাহিত্য, শাক্তসাহিত্য, ইতিহাসের কাহিনীসহ সমকালীন সমাজের নানা প্রেক্ষাপটকে যাত্রাপালাতেও একইভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র নাটকের পরিণতিতে যেমন ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখিয়ে মানবতাকে বড় করা হয়, তেমনি যাত্রপালাতেও ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়কেই সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির উর্ধ্বে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র নাটকে যাত্রাপালার প্রভাব আকস্মিক কোনো ঘটনা নয় ররং বাল্যকাল হতেই কবি যাত্রাপালার সাবলীল শিল্পনৈপুণ্যে মগ্ধ হয়েছিলেন। যাত্রাভিনয়ে দৃশ্যসজ্জা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে বলে তার প্রতি কবির আন্তরিক সমর্থন ছিল অতি মাত্রায়। সমাজ মানসের বিশুদ্ধতার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে যাত্রার প্রচলন করে জনশিক্ষাদানের পক্ষপাতি ছিলেন।

তিনি বলেছেন-

> যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে আমাদের চাষাভূষার যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে - সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।[২১]

'স্বদেশ সমাজ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ যাত্রাপালার গুরুত্ব শিক্ষিত সাহিত্য মহলের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি বাঙালির আদি সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক লোকমাধ্যম গুলোর প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তিনি ইউরোপীয় ও সংস্কৃত নাটকের চেয়েও অধিক মূলাশ্রয়ী নাটক হিসেবে যাত্রানাট্যকে জনসমাজের কাছে অধিক প্রায়োগিক মনে করেছেন। তিনি বলেছেন-

> আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানিয়ে দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহলাদে দেশের লোক দূর-দূরন্ত হইতে একত্র হইত। ..... সেখানে ভাল কথক, কীর্তন গায়ক, ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। [২২]

রবীন্দ্রনাথের নাটকে লোকনাট্য যাত্রাপালার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করেছেন দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। তিনি যাত্রা বিষয়ে একটি প্রবন্ধে যাত্রাপালার গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের আঙ্গিক গঠনে ও চরিত্রায়ণের মধ্যে যাত্রপালার প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র নাটক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেছেন-

> রবীন্দ্রনাথ প্রথানুগ নাটকের পথ ছেড়ে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধরনের নাটক লিখতে শুরু করলেন, তখন বহিরাঙ্গ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন বলেই গানে, বিবেকে এবং অন্যভাবে যাত্রার রীতিনীতি মুঠোয় ভরে নিতে তাঁর অস্বস্তি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা জাতীয় যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন, বাউল বৈরাগী বলে যাদের মঞ্চে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাদের কেউ ঘটনায় জড়িয়ে, কেউ তাঁর নিষ্ক্রিয় নিয়ন্ত্রা, কেউ আবার কর্মসংশ্রবহীন দর্শক ও ভাবুক মাত্র। তারা গদ্যে কখনও কিছু কথা বললেও গানই প্রধানত তাদের ভাষা। তারা সর্বদা

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের নৈতিকতার সুরটি বেঁধে দেয়। এরাই আধুনিক নাটকে বিবেকের সবচেয়ে সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার।[২৩]

ক্ষেত্র গুপ্তের মত অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রথানুগ নট্যপথ বলতে সম্ভবত সংস্কৃত ও প্রাশ্চত্য অনুকরণে রচিত সমসাময়িক নাটককেই বুঝেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র ধরনের নাটক বলতে তিনি শিক্ষিত মহলের রাইরে দেশের প্রান্তিক ও অবহেলিত সাধারণ জনগণের দ্বারা রচিত ও অভিনীত লোকনাট্য যাত্রপালাকেই বুঝেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মতের সপক্ষে আমার নিজেরও একটা জোরালো সমর্থন রইল। যুক্তি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্র-পাত্র, প্লট, মঞ্চ পরিকল্পনা ও আঙ্গিক গঠন ইত্যদির সঙ্গে লোকনাট্য যাত্রাপালার একটি তুলনামূলক আলোচনা করলে সবিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের কাহিনীতে রাজার সঙ্গে প্রজার বা সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ বা কথোপোকথন হয় সারাসরি, সেখানে রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ব কোন রাষ্ট্রীয় ধারণা দেয় না বরং সেখানে গ্রাম কেন্দ্রিক বিশেষ কোনো অঞ্চলের জমিদার এবং তার প্রজাদের মতবিরোধ ও তার অবসান লক্ষ করা যায়। উদাহরণ সরূপ আমরা অচলায়তন, শারদোৎসব, বিসর্জন, রাজা, রক্তকরবী, মুক্তধারা ইত্যাদি নাটকের কাহিনীর কথা বলতে পারি। রবীন্দ্র নাটকে রাজার সাঙ্গে প্রজার কথোপকথন মুখোমুখী এখানে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তের যোগাযোগটাও সরাসরি। কোনো বাঁধা-বিপত্তি ছাড়াই প্রজারা অবলীলায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে। এমন কি বাউল বৈরাগী, ফকির–সন্ন্যাসীরাও কখনো রাজার মতের অনুসারি, বিশেষ করে রাজা যখন প্রজাবৎসাল ও সুন্দরের অনুসারী। 'রাজা' নাটকে ঠাকুর দা দারুণভাবে রাজার অনুসারী, রাজার অপ্রকাশ্য রূপের বহি:প্রকাশ হিসেবে তাঁর আবেগময় বিরাজ সর্বব্যাপী রাজাময় করে দিয়েছে।

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে?

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল– একজন না দু'জন না, রাস্তার দু ধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেতো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করেন না।

কুম্ভ। তা, আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কি!

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায় – আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে– ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।[২৪]

আবার "মুক্তধারা" নাটকের রাজা যখন অত্যাচারী তখন ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজার সামনেই তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে। সে নির্ভয়ে রাজার সঙ্গে হাস্যজ্জ্বল মুখে শাস্তির পরোয়া না করে স্বয়ং রাজার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন। পরাধীনতার শিকল ভাঙার জন্য রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সমস্ত প্রজাদের আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য জাগিয়ে তুলেছেন।

রণজিৎ। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বৈ তো নই। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো বৈরাগী তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওয়ালা সেখনেই বাস করেন। ...

গান

রইল বলে রাখলে কারে?

হুকুম তোমার ফলবে কবে?

টানাটানি টিকবে না, ভাই,

রবার যেটা সেটাই রবে। [২৫]

একই ধরনের কণ্ঠস্বর আমরা লোকনাট্য যাত্রাপালার বিবেকের মধ্যে পেয়ে থাকি। বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি যাত্রাপালর নাম ভিখারীর ছেলে। এ পালাতে অত্যাচারী রাজা মোহন যখন তার নিরীহ প্রজাদের উপর খাজনা আদায়ের জন্য চাবুক মেরেও নিপীড়ন করতে থাকে তখন পাগলরূপী বিবেক তার গগণবিদারী গানের মাধ্যমে রাজাকে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

রাজাকে উদ্দেশ্য করে বিবেকের গান-

Dhaka University Institutional Repository

হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার, হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার

মানুষকে ক্ষমা করলে ওরে

ভগবানের কাছে পাবি বিচার।

হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার, হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার।

এখনো তোর সময় আছে

থেমে যা ঐ পাপ কাজ হতে

অত্যাচারীর হবেই পতন, অত্যাচারীর হবেই পতন,

জ্বলেপুড়ে হোবি ছারখার।

হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার, হুশিয়ার ওরে হুশিয়ার।[২৬]

ভাষারীতি ও সংলাপ বিচারে লোকনাট্য যাত্রাপালার সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের সাদৃশ্য বিষেশভাবে লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য নাটক হল বিসর্জন। এনাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে কাহিনীতে ব্যাপকভাবে লৌকিকতা পরিলক্ষিত হয়। একে কোনো কোনো গবেষক যাত্রাপালার একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। লৌকিকতা হল যাত্রাপালার প্রাণ ভোমরার মতো। এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্র ও সংলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যাত্রপালার সঙ্গে বহুলাংশে মিল পাওয়া যাবে। যাত্রাপালায় যেমন চরিত্রের আভিজাত্য অনুযায়ী সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্র প্রয়োগ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট বলেই পরিগণিত হয়। যাত্রাপালাতে রাজ-রাজড়ার সংলাপগুলো সাধারণত দীর্ঘ ও সাধুরীরতি সমৃদ্ধ হয়, গ্রম্য চরিত্র, প্রজা সাধারণের সংলাপ আকারে ছোট ও আঞ্চলিক ভাষারীতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি যত্রাপালার নাম "রূপবান"। এ পালাতে একুববার বাদশার সংলাপের সঙ্গে দুখীরামের সংলাপের প্রবল পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিসর্জন নাটকের রাজা গোবিন্দ্যমানিক্যের সংলাপের সঙ্গে অপর্ণা চরিত্রের কিংবা প্রজা সাধাণের সংলাপের পার্থক্যও বেশ চোখে পড়ার মতো।

যাত্রাপালাকে গ্রামের মানুষ নাটক না বলে বরং যাত্রাগান বলতেই অধিক পছন্দ করে। কোনো কোনো গ্রাম্য যাত্রাপালায় সংলাপের চেয়ে গানের পরিমাণ অধিক থাকে বলেই এমনটি মনে করা হয়। যাত্রর প্রধান আকর্ষণ হল

Dhaka University Institutional Repository

তার গান। আর এ কারণে যাত্রাপালাতে গানের সংখ্যা অধিক। লোকনাট্য যাত্রাপালার গীতিবহুল বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে অতি সহজেই আত্মীকরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্র নাটকে গানের আধিক্য মূলত যাত্রা প্রভবিত বলেই মনে করা হয়। তাঁর অধিকাংশ নাটকে ন্যূনতম দশ থেকে শুরু করে সর্বোচ্য সাতাশটি গান রয়েছে। নাট্যমঞ্চ নির্মণের ক্ষেত্রেও তিনি লোকনাট্য যাত্রাপালার আদলকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন করেছেন বলে মনে হয়। রক্তকরবী পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাট্যের আঙ্গিক যে কতটা যাত্রা নির্ভর তা আরো বেশি পষ্ট হয়ে গেল।

এখন আসি যাত্রাপালার অন্যতম আকর্ষণ বিবেক, দর্বেশ, পাগল, ফকির, সন্ন্যাসী প্রমূখ চরিত্রের সমান্তরাল চরিত্রের প্রভাব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাটক মুক্ত হতে পেরেছে কি না। যাত্রার বিবেক চরিত্র রবীন্দ্রনাথকে যে ভীষণভাবে বিমুগ্ধ করেছিল একথা আজ প্রমাণীত হয়েছে । তাঁর রচিত প্রায় সকল নাটকে যাত্রার বিবেকের ন্যায় এক বা একাধিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ নাটকের নিয়ন্ত্রক বা চালিকাশক্তি বিবেক সাদৃশ্য এ সকল চরিত্র। বিশুপাগলা (রক্তকরবী); ঠাকুর দা (রাজা); সন্ন্যাসী (প্রকৃতির প্রতিশোধ); অপর্ণা (বিসর্জন); দাদাঠাকুর (শারদোৎসব); ঠাকুরদা (ডাকঘর); ধনঞ্জয় বৈরাগী (মুক্তধারা); অন্ধ বাউল (ফালগুণী); রাজপুত্র (তাসের দেশ); উপাসক (তপতী); ধনঞ্জয় (পরিত্রাণ); পুরন্দর (বাঁশরি); ঠাকুরদাদা (ঋণশোধ); প্রকৃতি (চণ্ডালিকা); ধনঞ্জয় বৈরাগী (প্রায়াসচিত্ত); সন্ন্যাসী (কালের যাত্রা); নলিনী (শোধবোধ); ব্রাহ্মণগণ ও মালিনী (মালিনী); বাল্মীকি (বাল্মীকি প্রতিভা); কবি (বসন্ত); নটরাজ (শেষ বর্ষণ); প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তা মূলত যাত্রাপালার বিবেকের ভূমিকাকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের শিশু মন শৈশব থেকেই যাত্রাপালা দ্বারা দরুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এ প্রভাব শুধু রবীন্দ্রনাথের নাটকেই প্রতিয়মান তা কিন্তু নয় বরং রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই অল্পবিস্তার লক্ষ করা গেছে। সদামাটা এই বিবেক চরিত্রই কবিকে স্বদেশি ধারার নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল কি না তা আজ ভাবনার নয় বরং গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত বলে মনে করি।

রবীন্দ্র নাটকের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য চাষা–ভূষা চরিত্রের সাবলিল ব্যবহার। সাধারণ চরিত্র রবীন্দ্র নাটকের আনিবার্য বিষয় মনে হয়েছে। ছোট গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রাম্য চরিত্রের সাক্ষাৎ অল্পবিস্তর পরলক্ষিত হয় বটে, তবে তা নাটকের মতো এত ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ করা যায় না। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে নাটকে গ্রাম্য চরিত্রের প্রয়োগ দারুণভাবে উজ্জ্বল ও মোহনীয় রূপে ধরা পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যাক-

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

১। মিথ্যে কথা রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২। দেখব কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১। এ আবার কে রে ? বুকের ভিতরটা হঠাৎ চমকিয়ে দিল।

৩। তা বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ওসব মানিনে।[২৭]

যাত্রাপালাতেও রবীন্দ্রনাট্যের মতো সাধারণ চরিত্রগুলো একই রকম সালীল ও অনাড়ম্বর মাধুর্যের অধিকারী। বাংলাদেশের একটি অতি জনপ্রিয় যাত্রাপালা 'ভিখারীর ছেলে' তে প্রায় একই ধরনের কণ্ঠস্বর আমরা যোগেন নামের একটি চরিত্রের মুখ থেকে শুনতে পায়।

যোগেন: কোথায়? কোথায় আমাদের রাজা। আমি রাজার নিকটে বিচার চাইব।

রাজা : কে তমি ? কী তোমার অভিযোগ?

যোগেন : মহারাজ । আমার যোগেন নারায়ণ। আমি আপনার সামান্য একজন প্রজা। আপনার সেনাপতি আমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রী গিয়েছিল বাঁধা দিতে তার কোলে ছিল আমার কচি ছেলে তাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। আপনি এ অন্যায়ের বিচার করুন মহারাজ, বিচার করুণ।[২৮]

ড. সুকুমার সেন মনে করেন 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', ও 'রথের রশি', নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বংলার লোকনাটক যাত্রপালাকেই যেন চূড়ান্ত স্বকৃতি দিয়েছেন । তাঁর দৃষ্টিতে এ তিনটি নাটক রবীন্দ্র প্রতিভায় যাত্রাপ্রীতির ফল বলেই মনে হয়। যাত্রাপ্রীতি কেবল সাময়িক মুগ্ধতা নয়, বরং সেটি তাঁর নট্যপ্রতিভার মর্মমূলে পোক্তভাবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল বলেই এ গবেষক মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

> অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যে দুই তিনটি নাটক লিখলেন, 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশি', তাহাতে দৃশ্যবিভগ নাই। যাত্রার আসরের মতো রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রীর আসা যাওয়া। তবে একটি পশ্চাৎপট বা পৃষ্টভূমিকা দৃশ্য আছে।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের নট্যপ্রতিভাকে সাহিত্য গবেষকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। তবে এসকল মতামতের কোনোটিতেই তাঁর নাট্যপ্রেরণার মৌলিক উৎসমূলের সন্ধানে মুক্তচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। যেসকল গবেষক তাঁর নাট্য প্রতিভাকে শেকড় সন্ধানী মনে করেছেন, আধুনিক নাট্য সালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁরাও যাত্রাওয়ালা হয়ে উঠেছেন। আর এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তার[৩০] মৌলিক বিষয়কে অনুধাবন করতে আমরা একদিকে যেমন ব্যর্থ হয়েছি, তেমনি হাজার বছর ধরে চলে আসা বাঙলির আদি ও আসল নাট্টাঙ্গিকের অপমৃত্যু ঘটিয়েছি। সাহিত্যিকদের গোড়ামীর কারণে বাংলা নাটকের ইতিহাস হয়ে উঠলো উনিশ শতকীয় অর্বাচীন ইতিহাস। এ যেন আসল মায়ের জীবন্ত কবর রচনা করে ইউরোপীয় বিমাতা নাট্য ইতিহাস দখল করে নিল প্রকৃত মায়ের আসন। ইউরোপীয় নাট্যদাস হয়ে গেল আমাদের নাটক। বাংলা নাটকের চিরায়ত ইতিহাসের অপমৃত্যু ঘটল ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রাপালাকে সাহিত্যিক মহল কর্তৃক অবমূল্যায়ণের কারণে।

সিদ্ধান্তঃ যাত্রাপালার অভিনয় নৈপুণ্যের ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ হয়ত তাঁর নাটকের আঙ্গিক গঠনকৌশলকে বদলে নিলেন নিজের মতো করে। আধুনিক কালের উপযোগী করে লোকনাট্য যাত্রপালার বিষয় বৈশিষ্ট্যকে নিজ নাট্যকর্মে আত্মীকরণ করতে পেরেছিলেন অতি সহজে। আর এ কারণে তাঁর নাটক বংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যাত্রানাট্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসেবে স্থান পেল। আমি মনে করি রবীন্দ্র নাটকের অভিনয় কোশলই হল নাট্যে যাত্রার অভিনয় কৌশল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র:

১. উইকিপিডিয়া, মুক্ত *বিশ্বকোষ*, https://bn.wikipedia.org//wiki//

২. ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, কলিকাতা, ভাদ্র,১৩৬৭, পৃ. ৩৯৬।

৩. পবিত্র সরকার, নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, কলিকাতা, ১লা বৈশাখ,১৩৭১, পৃ. ৪০৫।

৪. শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অভিনয় শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৯৩২ খ্রি. পৃ. ৩১৯।

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৯৬।

৬. অহীন্দ্র চৌধুরী, *বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গ্রিশচন্দ্র*, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১৯।

৭. জিয়া হায়দার, *যাত্রার উপস্থাপনা পদ্ধতি*, (সৈকত আজগর সম্পা. 'বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ২৩৫।

৮. ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, *লোকাভিনয়ের ধারা, সৈকত আজগর সম্পা. প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩-৩৪।

৯. খোন্দকার নুরুল আলম, *যাত্রা ও তার বৃন্দাবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১০.শ্রীমন্ত কুমার জানা, *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা যাত্রা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

১১.প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯।

১২.ড. অজিত কুমার ঘোষ, *যাত্রা: সেকাল ও একাল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২১।

১৩.প্রভাত কুমার দাশ, *যাত্রা: উৎপল দত্তের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

১৪.ড. নাজমুল আহসান, যাত্রা: একটি জীবনধর্মী আঙ্গিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

১৫.মোহসিন হোসাইন, যাত্রায় আমার শুভযাত্রা ও কিছু কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

১৬.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*তপতী*', কলকাতা, ১৯ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ,পৃ. ১।

১৭.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*রঙ্গমঞ্চ*' বিচিত্র প্রবন্ধ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৪০১, বঙ্গাব্দ, পৃ. ২।

১৮.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*রক্তকরবী*' কলিকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১।

১৯.সুকুমার সেন ' '*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*', ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩১, ২৩২।

২০.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

২১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*স্বদেশি সমাজ*', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা আকাদেমি কলকাতা।

২২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*কালান্তর*', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা আকাদেমি কলকাতা।

২৩.ক্ষেত্রগুপ্ত, '*যাত্রার বিবেক- থিয়েটারের বিবেক এবং কিঞ্চিৎ নিয়তি*' (সৈকত আজগর সম্পাদিত; বাংলা একাডেমি; ঢাকা. এপ্রিল, ২০০২) পৃ.৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

২৪.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', '*রাজা*', বিশ্বভারতী, গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৭, পৃ. ৩৪, ৩৫।

২৫.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', '*মুক্তধারা*', বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯২২, পৃ. ২৯।

২৬.মোঃ জালাল উদ্দিন, " *ভিখারীর ছেলে*", যাত্রাপালা, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৪৬।

২৭.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', '*মুক্তধারা*', বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯২২, পৃ. ২৪।

২৮.জালাল উদ্দিন, প্রাগক্ত,পৃ.১৫,১৬।

২৯.সুকুমার সেন '*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*', ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকতা, ১৩৫৩, পৃ.২৭৪,৭৫।

৩০.সাইমন জাকারিয়া, *নাট্যচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেণিচরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেণিচরিত্র

যাত্রাপালা অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় বাংলা লোকনাট্যের একটি পরিচিত আঙ্গিক। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাপিত জীবনের কথা যাত্রাপালার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে যাত্রার যোগসূত্র অতি ঘনিষ্ট, যাত্রা গানভিত্তিক নাট্যকলা হওয়ার কারণে গ্রামীণ জনপদের মানুষেরাই এর প্রধান দর্শক। যাত্রাকে জীবধর্মী করার পিছনে অন্যতম একটি কারণ হিসেবে যে বিষয়টি কাজ করে তা হল এর আবেগ অনুভূতি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্যতা। বিষয়গত দিক থেকে যাত্রাপালা এখনও সর্বসাধারণের সম্পদ হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কাছে যাত্রার আবেদন অনেকাংশে ঐতিহ্যের বাহকের মতো। এ কারণে যাত্রার পাঠক–দর্শক–শ্রোতাদের শ্রেণিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ মনস্তত্ত্বের দ্বারা গ্রথিত। যাত্রাপালা রচনা, অভিনয় ও মঞ্চায়নের সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তাদের মধ্যে প্রায় ৯০% ভাগ মানুষই গ্রামীণ জনপদের অধিবাসী। তাই যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেণিচরিত্রকে বুঝতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে তা হল, গ্রামীণ সামাজি ও সংস্কৃতির স্বরূপ উপলদ্ধী করা। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যাত্রাপালায় যারা অভিনয় করেছেন, সে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বংশ পরিচয় অনেকটাই নিম্নবর্গের। যাত্রাপালার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে 'যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করা হল:

> আমাদের দেশের যাত্রাকরেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয়তো ভূমিকর্ষণ করিত বা নৌকা চালাইত কিংবা ভার বহন করিত, তাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু একবার সুশিক্ষিত মার্জিত রুচির কতকগুলি যুবা বাবু যাত্রাকার হইয়াছিল। তাহারা অপর যাত্রাকর দিগের ছিন্ন মলিন পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিয়া মার্জিত রুচির উপদেশানুবর্তী হইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়াছিল; আমরা আহ্লাদিত চিত্তে তাহা দেখিতে গেলাম; পথে শুনিলাম সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে। যাত্রার স্থানে গিয়া দেখি, মোগলাই পাগড়ী মাথায়, আলবার্ট চেন শোভিত, চসমা নাকে, হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতকগুলি লোক কথাবার্তা কহিতেছে। পরে শুনিলাম তাহাদের একজন নাম রাম, একজন লক্ষ্ণণ আর সকলে পরিষদ। আমরা কপালে হাত দিয়া বসিলাম।[১]

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের মনস্তত্ত্ব থেকে যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেনিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। তবে চিরপরিচিত একটি প্রবাদ আছে "যাত্রা করে ফাত্রা লোক"। যাত্রাপালার কিছু কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর বংশীয় আভিজাত্য কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালো থাকলেও এদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল

Dhaka University Institutional Repository

বহিমিয়ান স্বভাবের। যাত্রাপালার অভিনেতাদের বহিমিয়ান স্বভাবের পরিচয় বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে এসেছে। সাহিত্যিকদের ভাষ্য মতে যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি-বর্গ ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা সাধারণত বাউণ্ডেলে স্বভাবের হয়ে থাকে, পরিবার–পরিজনদের সাথে সম্পর্কের গভীরতাও বেশ কম হয়ে থাকে। যাত্রাপালার অভিনেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসে যে মন্তব্য করেছেন তা তুলে ধরলেও যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রেণি-চরিত্র সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা পাওয়া যাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত নিম্নরূপঃ

> কাল বিকালে বিনোদিনী অপেরা পার্টি আসিয়া পৌঁছেছে। মস্ত দল সঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স। দেখিয়া গ্রামের লোক খুঁশি হইয়াছে। দলের অধিকারী বিএ ফেল, তবে দলে তাহার দু'জন বিএ পাশ অভিনেতা আছে শোনা অবধি সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সাতগাঁর কাছারি-বাড়িটা সাফ করিয়া যাত্রাওয়ালাদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। দলের সকলের মশারি নাই, কুমুদের আছে। রাত্রে তার ঘুম মন্দ হয় নাই। সকালে উঠিয়া সে শশীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। শশী অবাক হইয়া বলিল, তুই; কুমুদ কুমুদ হাসিয়া বলিল, 'নারে আমি প্রবীর'। শশী বুঝিতে পারে না-প্রবীর কী, প্রবীর ? গ্রামে বিনোদিনী অপেরা পার্টি এল, চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে, খবর পাস নি? তুই যাত্রাদলের সঙ্গে এসেছিস কুমুদ? তুই যাত্রা করিস?..কুমুদ বলিল,'করি বৈকি যাত্রা'। প্রবীর সাজি, লক্ষণ সাজি, আরো কত কি সাজি। গলা ফাটিয়ে বলি। সত শ মেডেল পেয়েছি। শশী অবাক হইয়া বলিল,'আয় ঘরে আয়। বসে সব বলবি চল।' যাত্রার দলে ঢুকলি কেন? 'সে এক ইতিহাস শশী,। বাড়ি থেকে দিলে খেদিয়ে। নিলাম চাকরি। চাকরি থেকেও খেদিয়ে দিল। একদিন অন্তর অফিসে গেলে কে রাখবে? ঘুরতে ঘুরতে বহরমপুরে বিনোদিনী অপেরা পার্টির যাত্রা শুনে অধিকারীর সঙ্গে ভাব জমালাম। পরীক্ষা করে শত্তর টাকা মাইনে দিয়ে দলে নিলে। দু-চারটে সেনাপতির পার্ট করে গলা খুলল, খুব আবেগ ভাবে চেচাতে শিখলাম। এক বছরের মধ্যে মেন অ্যাকটর। আশি টাকা মাইনে দেয়। কুমুদ হাসিল। শশী ও হাসিল, তুই শেষে যাত্রা করবি একথা ভাবতেই পারতাম না কুমুদ। কুমুদ- আমি ও পারতাম না।[২]

যাত্রানাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রচয়িতা ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের চারিত্রিক গুণাবলি ছিল বহুমুখী। তবে অধিকাংশ যাত্রাপালার রচয়িতা ও অভিনেতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিল। বাংলাদেশের কৃতি সন্তান প্রখ্যাত স্বদেশি যাত্রা রচয়িতা ও অভিনেতা মুকুন্দ দাস।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

> স্বদেশি যুগের যাত্রায় প্রধানত ঐতিহাসিক স্থান লাভ করিল।...একদিন এই শ্রেণির যাত্রায় মহাপুরুষের জীবন কথা কীর্তিত হয়েছে। এই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রা রচয়িতার জন্ম হয়; তাঁহার নাম মুকুন্দ দাস। তিনি বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশী যাত্রার লেখক। শুধু তাই নহে তিনি সুগায়ক উত্তম অভিনেতা ও স্বয়ং যাত্রাদলের পরিচালক ছিলেন। যাত্রাগানের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের বাণী তিনি বাংলার দূরতম পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়েছেন। কেবল রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামই তাঁহার যাত্রা রচনার বিষয় ছিল না, সমাজ সংস্কার ও তাঁহার লক্ষ ছিল।[৩]

বাংলাদেশের যাত্রাভিনেতাদের অভিনয় কুশলতা যোগ্যতার মাপকাঠিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত নাট্য গবেষক ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন-

> বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেত্রীবর্গ বড় অনুকরণপ্রিয়। নবীন অভিনেতারা পূর্ববর্তী অভিনেতার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, স্বর প্রভৃতি অনুকরণ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন। আদর্শের অনুকরণ করা অনেক বিষয়ে ভালো; কিন্তু অভিনয় কলার আদর্শ সংহার করা বিবেচনা সাপেক্ষ। অভিনেতার পক্ষে অভিনেতব্য চরিত্র এই আদর্শ। পূর্ববর্তী অভিনেতার ব্যক্তিগত হাবভাব নহে। কোন অভিনেতা ছেদ ভেদহীন, যতিহীন আবৃত্তিতে কোন অংশে অভিনয় করেন; তাঁহার আদর্শে তাঁহার সকলেই সেরুপ করিবে।[৪]

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর পূর্ববর্তী যাত্রাভিনেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও অভিনয় যোগ্যতাকে উপলব্ধি করে নাটক রচনা শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়। যাত্রাপালা দর্শনের মাধ্যমেই তিনি নাট রচনায় ব্রতী হয়েছেন একথা যদি সত্যি হয় তাহলে তৎকালীন যাত্রাভিনেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অতি উন্নত ছিল বলেই ধরে নিতে হয়।[৫] যাত্রাভিনেতাদের চারিত্রিক কুশলতাই তাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে। অভিনেতার চারিত্রিক দক্ষতা সম্পর্কে সুনীল দত্ত তাঁর সেকালের নাট্যচর্চা গ্রন্থে বলেছেন-

> মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গিয়ে পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর হোসেন সাহেব আসিয়া রয়েল বক্সে বসিয়াছেন। 'আবুহেনা' বেশী নাট্যাচার্য্য হাস্য-রস-সাগর অদ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ন হইয়া দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'এই সুর দিয়েছেন কে - বাবু হোসেন আর আজ দেখতে এসেছেন কে - আমীর হোসেন। এই বলিয়া বক্সের দিকে চাহিয়া সুদক্ষ অভিনেতার সুনিপুণ ভঙ্গিতে হাস্যরসের সহিত এরূপ কৌশলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন করলেন যে তাহা কেবল অদ্ধেন্দু শেখরেরই সম্ভব।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাট্য যাত্রার প্রথম নারী অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসি সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তর থেকে অভিনয় জগতে উঠে এসেছিলেন। শোনা যায় পতিতালয় থেকে গিরিশচন্দ্র তাকে নিয়ে এসেছিলেন অভিনয় জগতের রঙ্গমঞ্চে।

বিনোদিনীর শ্রেণি- চরিত্র ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার গিরিশ্চন্দ্র সেন বলেন–

> রঙ্গালায়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাঁহার নিজগুণে অধিক। উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার একটি কন্যা সন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে কন্যা নীচুকুলোদ্ভাবা এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী আপণ বলিয়া জানিত কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের অনুনয় বিনয় করে কিন্তু তাঁহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয় প্রবেশের বাঁধা প্রদান করিয়াছিল, শুনিতে পাই.., অভিনেতা - অভিনেত্রীর জীবন প্রবাহ সুখ-দুঃখে জড়িত হইয়া সাধারণের কৃপা প্রার্থনায় অতিবাহিত হয় এবং সাধারণের আনন্দের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।[৭]

যাত্রানাট্যের অভিনেতাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ অভিনেতা নিরক্ষর, ৩০ শতাংশ প্রাইমারি মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা, ৭ শতাংশ মাধ্যমিক পাশ এবং ৩ শতাধিক উচ্চ মাধ্যমিক থেকে তদোর্ধ পাশ। যাত্রাশিল্পের অভিনয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ আছে সত্য তবে অভিনেতার অভিনয় শিক্ষিত মহলের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে বলে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন। তিনি বলেছেন–

> এইসব যাত্রাপালা অভিনয়কালে কোন কোন চরিত্রাঙ্কনে গ্রাম্য অশিক্ষিত অভিনেতারা এমন সুন্দর অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন যা কলিকাতার নামজাদা নাট্যকারেরাও অনুসরণ করিতে পারে।[৮]

নাট্য গবেষক আসকার ইবনে শাইখ তাঁর 'যাত্রা ও নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধে যাত্রানাট্যের অভিনেতাদের সামাজিক অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে যাত্রাশিল্পীদের অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে জাত-পাতের বিচার নেই বলেই জানিয়েছেন।[৯] যাত্রাপালার অভিনেতাদের শ্রেণি-চরিত্র সম্পর্কে তাজমিলুর রহমানের মনোভঙ্গীও প্রায় অনুরূপ। তিনি বলেছেন:

> অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে যাত্রা নামে এক প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই যে, যাত্রার গীতি পায়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে। অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন এসব যাত্রায় ভদ্র সমাজে কদাপি সন্তোষ বিধান না হইলেও এদের লক্ষ প্রমোদ - প্রমত্ত 'ইতর লোক' এসব যাত্রাভিনয়ে সীমাহীন আনন্দ পেতেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদে জীবন, মান ও সামাজিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের পালাসম্রাট খ্যাত যাত্রাভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অর্থনৈতিক শ্রেণিচরিত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। তিনি মনে করেছেন এক ধরনের সামাজিক দৈন্য থেকে যাত্রাশিল্পীরা অভিনয়ে আসতে বাধ্য হয়। তিনি বলেছেন–

> যাত্রাশিল্পের উপর জীবিকা নির্ভর যাত্রাশিল্পী ও যাত্রাকর্মীরা যাত্রা মালিকদের সঙ্গে ৬/৭ মাসের মেয়াদী চাকুরীতে বন্দোবস্ত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্কের মাস মাহিনায় ১ থেকে ৩ মাসের দাদনের ভিত্তিতে চাকুরীতে চুক্তিবদ্ধ হয়। মহড়া চলাকালীন সময়ে যাত্রাশিল্পী ও যাত্রাকর্মীরা কোন প্রকার বেতন পান না। কেবল মাত্র তাদের দু'বেলা খাবার ও জল খাবার সরবরাহ করা হয়। [১১]

শিক্ষাকেই যে কোন সমাজের মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণি সচেতনতার মানদণ্ড নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাত্রাশিল্পের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের শ্রেনি-চরিত্র নির্ণয় করতে হলে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বিচেনায় নেওয়া দরকার। যাত্রাশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিনেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তপন বাগচীর অনুসন্ধান নিম্নরূপঃ

> যাত্রার সঙ্গে যারা জড়িত, তাঁরা খুব বেশি শিক্ষিত নন। শিল্পীদের মধ্যে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কোন শিল্পীকে পাওয়াই যায় নি। তবে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন এমন রয়েছেন ৪০.০২%। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন এমন শিল্পী রয়েছে ৩৩.৭%। অবশিষ্ট ২৬.১% শিল্পী কখনই স্কুলে যান নি। [১২]

যাত্রাশিল্পের ক্রমাবনতি ও পঙ্কিলতায় নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণ শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যাত্রাশিল্পের যোগসূত্র স্থাপিত না হওয়া। যাত্রাশিল্পকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি একটি বড় ধরনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি মনে করি। যাত্রাভিনেতাদের সামাজিক শ্রেণি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তপন বাগচীর সরোজমিনে গিয়ে ক্ষেত্র জরিপ করে বলেছেন–

> আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চশিক্ষিত লোকেরা যাত্রাশিল্পের সঙ্গে খুব বেশি সম্পৃক্ত হন না। যাত্রাশিল্পকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়। যাত্রাশিল্পীদের বড় অংশ নিরক্ষর। শিল্পের প্রতি অদম্য আগ্রহে এরা যাত্রাদলে আসে। জীবিকার সন্ধান পেয়ে স্থায়ীভাবে যাত্রাদলে থেকে যান। বিকল্প কোন কাজ করার ক্ষমতা না থাকায় তারা যাত্রা ছেড়ে আসতে পারেন না। [১৩]

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী যাত্রাশিল্পীদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থা জানার জন্য ঢাকা জেলার শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতীয় যাত্রা উৎসবে অংশ গ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা দলের শিল্পীবৃন্দসহ, হেপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় বসবাসরত ৯৪ জন শিল্পীর সঙ্গে বিভিন্ন সময় প্রায় তিন বছর ধরে পরিচালিত ক্ষেত্রজরিপ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জানা গেছে পেশাদার ও শখের যাত্রাদলে যে সকল কলা-কুশলী যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত, তাদের মধ্যে দশ বছরের বালক থেকে শুরু করে প্রায় ৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ পর্যন্ত রয়েছে। যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ১৮ থেকে ৪০ বছরের নারী-পুরুষেরাই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। এ ব্যাপারে সারণি ১ থেকে বিস্তৃত ধারণা পাওয় যাবে।

সারণি ১ : যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স বিন্যাস [১৪]

বয়স	লিঙ্গীয় পরিচয়				মোট	
	পুরুষ		নারী			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১০-২০ বছর	৫	৮.৬	১০	২৭.৭	১৫	১৫.৯
২১-২৫ বছর	১৫	২৫.৮	১৬	৪৪.৪	৩১	৩২.৯
২৬-৩২ বছর	২০	৩৪.৪	৮	২২.২	২৮	২৯.৭
৩৩-৪০ বছর	৮	১৩.৭	০	০	৮	৮.৫
৪১-৫০ বছল	৫	৮.৬	০	০	৫	৫.১
৫১-৬০ বছর	৩	৫.১	১	১.৭	৪	৪.২
৬১-৭০ বছর	১	১.৭	১	১.৭	২	২.১
৭১ -৭৫ বছর	১	১.৭	০	০	১	১.০২
	৫৮	১০০	৩৬	১০০	৯৪	১০০

সারণি ১ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বৃত্তচিত্রের মাধ্যমেও দেখানো হলে এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র ১ : যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স বিন্যাসের শতকরা বৃত্তচিত্র।[১৫]

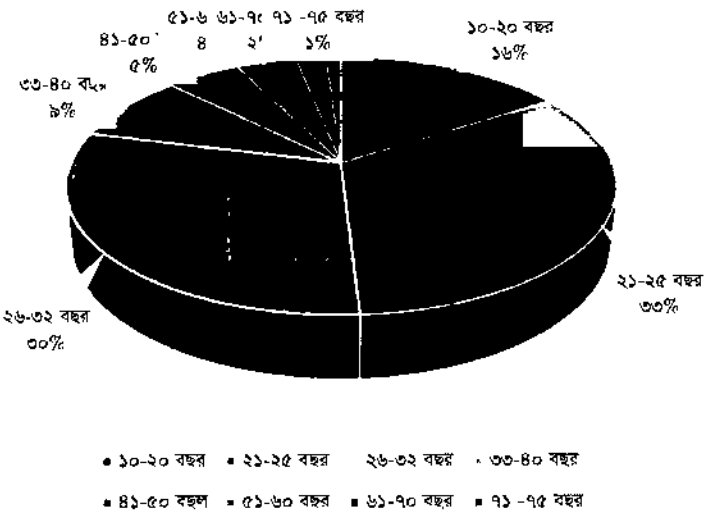

Dhaka University Institutional Repository

যে কোনো শ্রেণির মানুষের শ্রেণিচরিত্র ও সামাজিক অবস্থান জানার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়টি সবার আগে বিবেচনায় নেওয়া দরকার। যাত্রাপালা অভিনয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু শিল্পী থাকে। নারী-পুরুষ ভেদে শিক্ষার বিষয়টিও এ গবেষণায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। সারণি ২ থেকে যাত্রা শিল্পীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হল:

সারণি ২: যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস।[১৬]

		পুরুষ		নারী		মোট	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর	১৯	৩২.৭	১৯	৫২.৭	৩৮	৪০.৪
	প্রা.শিক্ষা	১৫	২৫.৮	১৩	৩৬.১	২৮	২৯.৭
	মাধ্যমিক	২১	৩৬.২	৪	১১.১	২৫	২৬.৫
	উ.মাধ্যমিক	২	৩.৪	০	০	২	২.১
	উচ্চ শিক্ষা	১	১.৭	০	০	১	১.০৬
মোট		৫৮	১০০	৩৬	১০০	৯৪	১০০

একই জরিপে যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। যাত্রাশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী পার হতে পারেনি। পুরুষ শিল্পীদের কিছু কিছু অভিনেতা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। এ বিষয়টি বৃত্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

বৃত্তচিত্র ২ : যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিন্যাসের শতকরা বৃত্তচিত্র।[১৭]

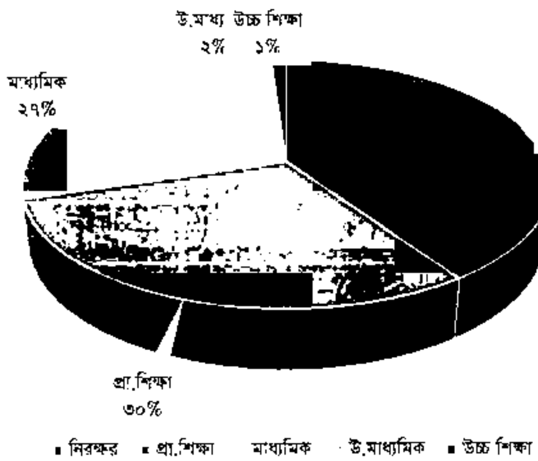

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে যাত্রাশিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা ও বংশ পরিচয় বিবেচনায় দেখাগেছে নারী অভিনেত্রীদের বেশিরভাগ অংশই এসেছে নিচুতলার পরিবেশ থেকে। কিছু নারী অভিনেত্রী এসেছেন নিম্নবিত্ত পরিবাবার থেকে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের কোন নারী যাত্রাপালায় অভিনয় করতে আসতে দেখা যায় নি। যাত্রালিপ্লের ৯৭% নারী অভিনেত্রীই এসেছেন হিন্দু ধর্ম থেকে। পুরুষ অভিনেতাদের এক-দুইজন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এলেও বেশি অভিনেতা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে যাত্রাপালায় এসেছে। নিম্নে সারণি: ৩ এর মাধ্যমে বিষয়টি সুক্ষভাবে দেখানো হল:

সারণি ৩: যাত্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান।[১৮]

		নারী	পুরুষ	নারী	নারী		
যাত্রা শিল্পীদের সামাজিক শ্রেণি		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
	নিচুজাত	৪	৬.৮	২৩	৬৩.৮	২৭	২৮.৭
	নিম্নবিত্ত	২০	৩৪.৪	১০	২৭.৭	৩০	৩১.৯
	নিম্ন মধ্যবিত্ত	৩০	৫১.৭	৩	৮.৩	৩৩	৩৫.১
	মধ্যবিত্ত	৪	৬.৮	০	০	৪	৪.২
	উচ্চবিত্ত	০	০	০	০	০	০
		৫৮	৯৯.৭	৩৬	৯৯.৮	৯৪	৯৯.৯

রেখাচিত্রে প্রকাশ করলে বিষয়টি নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়; যা গবেষকদের কাছে সহজেই বোধগম্য হবে।

রেখাচিত্র ১ : যাত্রাশিল্পীদের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান।[১৯]

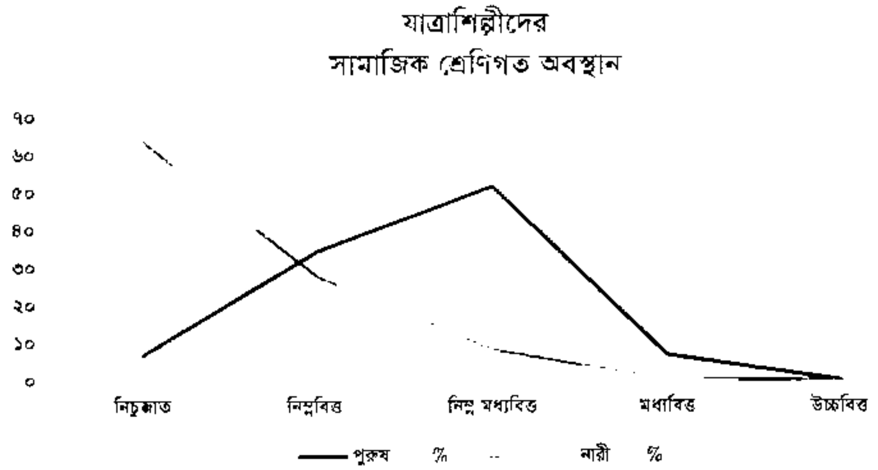

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত: আমি নিজেই যেহেতু যাত্রাপালার সঙ্গে আট-নয় বছর বয়স থেকে প্রায় পনের বছর জড়িত ছিলাম, ফলে ঐ সময় যাত্রাশিল্পের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আমি খুব কাছ থেকে দেখার ও মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। আট বছর বয়সে আমি প্রথম রূপবান যাত্রাপালায় ছোট রহিম চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রাদলে প্রবেশ করি। ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাশিল্পীদের জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে আমি বহু সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ সময় আলোচনা করার সুযোগও পেয়েছিলাম। যেহেতু আমি নিজে যাত্রাদলের একজন শিল্পী, তাই আমাকে আপনজন মনে করেই নারী শিল্পীরা তাদের জীবনের অনেক কথা আমার সঙ্গে বলত। কে কোন দূর্বিপাকের কারণে যাত্রাদলে এসেছে আমাকে তারা অনায়াসেই বলে দিত। যাত্রায় আগত অধিকাংশ পুরুষ অভিনেতাই বাবা-মায়ের সংসার থেকে বিতাড়িত কিংবা পারিবারিক জীবনের চেয়ে যাত্রাভিনয়কে ভালোবাসেন বলেই যাত্রাদলে যোগ দিয়েছেন।[২০] আমি অনেক যাত্রাভিনেতার কাছে শুনেছি যাত্রাভিনয় তাদেরকে মাদকতার ভয়াবহ নেশার মতই আকর্ষণ করে। আবার এমন অনেক অভিনেতাকে দেখেছি যারা শখের বসে যাত্রা অভিনয়ে এসে আর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন নি। এমন অভিনেতা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আসমাখালী গ্রামের বিখ্যাত যাত্রা অভিনেতা করিম শেখ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, ড. (সৌমিত্র শেখর সম্পা.)মার্চ ,২০০৫, পৃ. ৩৪।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৯১।

৪. ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালা*, *কলিকাতা*, ১৯১০, পৃ. ৮৬।

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *নাট্যশ্রী মধুসূদন*, *কলিকাতা*, ১৯৬৮, পৃ. ২১।

৬. সুনীল দত্ত, *সেকালের নাট্যচর্চা*, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৩০, পৃ. ১০।

৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রাগুক্ত, *আমার কথা ও বিনোদিনী দাসী*, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১৩২।

৮. জসীম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৯. আসকার ইবনে শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

১০.তাজমিলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১১. অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা,

১২. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, জুন, ২০০৭, পৃ.১৪৬।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

১৪. ক্ষেত্র জরিপ, ঢাকা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা, ২০১৬,১৭,১৮।

১৫. ক্ষেত্র জরিপ, ঢাকা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা, ২০১৬,১৭,১৮।

১৬. ক্ষেত্র জরিপ, ঢাকা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা, ২০১৬,১৭,১৮।

১৭. ক্ষেত্র জরিপ, ঢাকা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা, ২০১৬,১৭,১৮।

১৮. প্রাগুক্ত,

১৯. প্রাগুক্ত,

২০. গিরিশচন্দ্র সেন, *আমার কথা ও বিনোদিনী*, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ.১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

যাত্রাপালার পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের শ্রেণিচরিত্র

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

যাত্রাপালার পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের শ্রেণিচরিত্র

যাত্রাপালা অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় বাংলা লোকনাট্যের আঙ্গিক। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জাপিত জীবনের কথা যাত্রাপালার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে যাত্রার যোগসূত্র অতি ঘনিষ্ট। যাত্রা গান ভিত্তিক নাট্যকলা হওয়ার কারণে গ্রামীণ জনপদের মানুষেরাই এর প্রধান দর্শক-শ্রোতা। যাত্রাকে জীবধর্মী করার পিছনে অন্যতম একটি কারণ হিসেবে যে বিষয়টি কাজ করে তা হল এর আবেগ অনুভূতি যা সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করে। সামাজিক মূল্যবোধের বিষয় কে যাত্রা এখনো সর্বসাধারণের সম্পদ হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের কাছে যাত্রার আবেদন অনেকাংশে ঐতিহ্যের বাহকের মত। এ কারণে যাত্রার পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের শ্রেণিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ মনস্তত্ত্বের দ্বারা গ্রথিত। যাত্রাপালা রচনা, অভিনয় ও সঞ্চালনের সাথে যারা জড়িত থাকে তাদের মধ্যে প্রায় ৯০% ভাগ মানুষ গ্রামীণ জনপদের অধিবাসী। তাই যাত্রাপালার পাঠক দর্শক শ্রোতার শ্রেণী চরিত্রকে বুঝতে প্রথমেই যে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে তা হল গ্রামীণ সামাজিক সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষন করা। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত জনগণের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। বাংলাদেশের লোকনাট্যের একটি প্রাচীন রূপ যাত্রাপালা। প্রকৃতপক্ষে যাত্রাপালা গ্রামীণ জনপদের নিরক্ষর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক। যাত্রাপালায় যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করে তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় ও সামাজিকভাবে নিম্নস্তরের মানুষ। অভিনেতাদের অভিনয় কৌশলের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হল গ্রামীণ ভাব-ভাষার সরল প্রয়োগ। যাত্রার রাজাও অভিনয়ের সময় ভুলে যায় যে তিনি রাজার পাঠ করছেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাত্রাশিল্পীরা গ্রাম্যতাকে অতিক্রম করতে পারে না বলেই যাত্রাপালার দর্শকদের প্রায় ৯৫% মানুষ গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক ও নিরক্ষর নারী পুরুষ। যাত্রাপালার দর্শক শ্রোতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রুচিবোধের দিক থেকে স্থূল মানসিকতার অধিকারী। যাত্রাপালার দর্শক শ্রোতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাত্রা গবেষক তপন বাগচীর অভিমত নিম্নরূপ:

> গ্রামের সাধারণ দর্শকের কাছে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও যাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাঁরা যাত্রার ঐতিহ্যকে স্বীকার করেন বলে এর সংরক্ষণ ও প্রসার কামনা করেন। কিন্তু এর জন্য কার্যকর ও স্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

> উদযোগ গ্রহণ করার জন্য বেশি লোক সামনে পাওয়া যায় না। গ্রামে যাত্রা এলে মেলা বসে, মেলায় জুয়া-হাউজি চলে; দর্শকরা অশ্লীল নৃত্যের প্রদর্শন করার জন্য মালিকদের উপর চাপ প্রয়োগ করে।[১]

অশ্লীল অভিনয়ে নিপতিত বাঙালির সাংস্কৃতিক রুচিবোধ যে অত্যন্ত নিম্নস্তরের এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

> যে রচনা সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়, সেই রচনা সমাজে তৎকালীন রস গ্রাহিনী শক্তির পরিচয় স্বরূপ। রসহীন রচনা যদি কোন সমাজে সম্মান পাইয়া থাকে তবে অবশ্য সে সমাজকে রসজ্ঞ বলিতে হইবে। সেরূপ যে নাটক বা যাত্রা জনসমাজের প্রিয়, যে নাটক দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অনুভব করা যাইতে পারে। যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের রস গ্রাহিনী শক্তি কতদূর পরিমার্জিত হইয়াছে তাহা এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রাটি দ্বারা অনুভব হইতে পারে। এখানকার রুচির এই এক পরিচয় অশ্লীল নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের স্রোত বহিতে থাকে। অমনি বাহবা ঘন্টা পরিয়া যায়। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে। বেশ্যা স্বভাবানুকরণে পটু নাট। এক্ষণকার রুচির এই পরিচয়।[২]

যাত্রাশিল্পের অবনতির জন্য বাংলাদেশের পালা সম্রাট অমলেন্দু বিশ্ব দর্শক শ্রোতাদের বিকৃত রুচিকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন পূর্বের চেয়ে বর্তমান কালের দর্শক শ্রোতাদের নৈতিক অধ:পতন অনেক বেশি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

> বিকৃত রুচি দর্শক ও যাত্রা মালিকদের খামখেয়ালি যাত্রা আসরে উৎকট যৌন আবেদন পূর্ণ হিন্দি ও উর্দু গানের অনুপ্রবেশ ঘটতে সাহায্য করেছে। অনেকের ধারণা স্বঘোষিত রাজকুমারীদের কুরুচিপূর্ণ নাচের জন্য যাত্রা আসরে দর্শক সমাগম হয়। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপলব্ধি থেকে আমি বুঝেছি, যাত্রামোদী দর্শক পালা নাটক উপভোগ করতেই যাত্রা আসরে ভিড় জমায়, নাচের জন্য নয়। মফস্বল শহরের যাত্রার আসরগুলো তার প্রমাণ।[৩]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোক গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী মনে করেন যাত্রাপালার দর্শক শ্রোতা হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় সকল শ্রেণির মানুষের যোগ ছিল।

> পল্লী বাংলার সেই যে, স্বত:স্ফুর্ত আনন্দ ধারা, যার সঙ্গে যোগ ছিল জমিদার, প্রজা, ধনী-দরিদ্র,বড়-ছোট সকলের আনন্দের, তা থেকে এ যুগ পরিবেশ অনেক দূর সরে এসেছে। কী জানি কবি–কী যাত্রাগুলি লোক

Dhaka University Institutional Repository

> শিক্ষাও কম দিত না। পাপ যে পাপই, পাপ আর অন্যায় যে, কোন দিনই জয়ী হয় না; সত্য যে চিরদিনই সত্য এসব শিক্ষা, এইসব আনন্দ উৎসবের অবারিত প্রাঙ্গনে প্রচুর পরিমাণেই বিতরিত হত। লোকে তা গ্রহণও করতো। সভা সমিতি সমাবেশে বা গৃহে ও কথায় কথায় উদাহরণ এসে যেত।[৪]

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তিন ধরনের যাত্রাপালার অভিনয় রীতি প্রচলিত আছে।

১। ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালা।

২। সামাজিক ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালা।

৩। লোককাহিনীর বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালা।

যাত্রার বিষয়ভেদে দর্শক শ্রোতাদের শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ধর্মীয় যাত্রাপালা আবার দুই প্রকার। যথাঃ

১। হিন্দু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অভিনিত পালা। যেমন- রামযাত্রা, কুশান যাত্রা, ভাষান যাত্রা ইত্যাদি।

২। ইসলাম ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অভিনিত যাত্রাপালা। যেমন – ইমাম যাত্রা, কারবালা যাত্রা ইত্যাদি।[৫]

সামাজিক–ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে যে সকল যাত্রাভিনয় হয়ে থাকে, সেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একান্ত হিন্দু ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে যে সকল যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়, সে সব যাত্রাভিনয়ের দর্শক শ্রোতা হিন্দু ধর্মীয় নারী পুরুষ। এ সকল যাত্রা সাধারণত বাড়ির উঠান, মন্দির প্রাঙ্গণ, বা কোন খোলা জায়গায় অভিনিত হয়।[৬] কুশান যাত্রায় দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কে লোকনাট্য গবেষক সাইমন জাকারিয়ার অভিমত নিম্নরূপঃ

> কুশান গানের দলে শিল্পীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এই গানের আয়োজনের জন্য বায়নার টাকাটা একটু বেশিই লাগে। এই বায়না গ্রামের নিম্নবিত্তের কোন মানুষের পক্ষে এককভাবে দেওয়া সম্ভব নয় বলে সমাজের সবাই মিলে কুশান গানের বায়না করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বনে মন্দির কমিটি কুশান গানের আসর করে এ ধরনের পরিবেশনারীতির পৃষ্টপোষকতা করে থাকে। বিভিন্ন পূজাপার্বণ, মেলা লোকউৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কুশান গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।[৭]

কুশান যাত্রার দর্শকের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মানুষ ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষ স্বল্প পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ইসলাম ধর্মীয় যাত্রাপালার মধ্যে ইমাম যাত্রা অত্যন্ত পরিচিত একটি যাত্রাপালা। কারবালার কাহিনী অবলম্বনে রচিত

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রাপালার ৯০% দর্শক মুসলমান ধর্মাবলম্বী। সাধারণত গ্রামের বাড়িতে কিংবা খোলা মাঠের বর্গাকার উঁচু মঞ্চে এ ধরনের যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রায় সব শ্রেণি পেশার মানুষ ইমাম যাত্রার অভিনয় দেখতে আসেন। গ্রামীণ সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল মানুষ ইমাম যাত্রা উপভোগ করেন। এ যাত্রার দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কে গবেষকের মত হল:

> ইমাম যাত্রার আয়োজক মূলত হযরত মুহাম্মদ (স:) ও হযরত আলীর মতাদর্শে বিশ্বাসী পীরভক্ত ও পীর মুর্শিদগণ। পীরের বাড়ির ঔরসে যখন শত শত ভক্তের সমাবেশ ঘটে তখন পীর মুর্শিদগণ এর আয়োজন করে থাকেন। ইমাম যাত্রার আসরের জন্য পূর্ণ সদস্যের একটি দল সাধারণত ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বায়না নিয়ে থাকে।[৮]

সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে অভিনিত যাত্রাপালায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বয়সের দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ ধরনের যাত্রাপালায় নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে অভিনয় করা হয় বলে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি অনেক বেশি হয়। কোনো কোনো স্থানে লোকসংখ্যা দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত হয়ে থাকে।[৯]

আধুনিক কালের যাত্রাভিনয়ের আসরকে কেন্দ্র করে অনেক নেতিবাচক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই বর্তমান যাত্রাপালার দর্শক-শ্রোতাদের আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা:

ক) নাট্যামোদী দর্শক। এ শ্রেণির দর্শকরা যাত্রাপালার অভিনয় দেখতে যায়।

খ) জোয়াড়ি দর্শক। এ শ্রেণির দর্শক যাত্রাপালার অভিনয় দেখতে যায় না, বরং যাত্রা দেখার নাম করে বিভিন্ন ধরনের জোয়ার আড্ডা বাসায়।

গ) বিকৃত রুচির দর্শক। এ শ্রেণির দর্শক যাত্রার অভিনয়ের চেয়ে ডান্স দেখতে পছন্দ করে। ব্যবসায়িক স্বার্থে যাত্রা মালিকরা যে সব যুবতি মেয়ে নিয়ে আসে, সেই সকল স্বঘোষিত প্রিন্সেসদের অশ্লীল দেহ প্রদর্শনী দেখার জন্যই এ শ্রেণির দর্শকরা যাত্রা দেখতে ভিড় করে।[১০]

উনিশ শতকের আশির দশকের পর যাত্রানাট্যের অশ্লীলতার মাত্রা যাত্রাশিল্পে জেকে বসে। এ সময় থেকে যাত্রাপালা নীতি শিক্ষার পথ পরিহার করে কুশিক্ষার বাহন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। একালের সময়ে দর্শক-শ্রোতার নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ করা যায়, যা চরমভাবে সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িছে বলেও অনক গবেষক মনে করে। আগের দিনে দর্শকেরা যাত্রা দেখতে যেত যাত্রাপালার নাম শুনে। আর এসময়ের দর্শক-শ্রোতারা যাত্রা দেখতে যায় ডানাকাটা পরীদের নাম শুনে।[১১] এমন অভিযোগ অনেক গবেষক করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকেরা একথাও স্বীকার করেছেন যে, যাত্রার দর্শক-শ্রোতাদের তালিকায় গ্রামের সাধারণ জনগণের পাশা-পাশি বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তির্গের একটি অংশ যাত্রানাট্যকে বাঙালির আদি নাট্যাঙ্গিক বলে মনে করতেন। দর্শক হিসেবে তাঁরা কদাচিৎ যাত্রার আসরে উপস্থিত হয়ে যাত্রাপালার অভিনয় উপভোগ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমূখ ব্যক্তির যাত্রাভিনয় দর্শন প্রসঙ্গে পল্লী কবি জসীম উদ্দীন বলেন:

> আমাদের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে প্রথমে এদেশের চারণ কবি, বরিশালের মুকুন্দ দাসই নতুনভাবে লোকনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। রস পরিবেশনা নয়। তাঁহার যাত্রাদলে গ্রাম্য সুরে তিনি যে সব রচনা করিয়া গাইতেন, পরবর্তী যুগে আমাদের স্বনামধন্য নজরুল ইসলাম তাহার অনেকগুলির সুর ও ভাব অবলম্বন করিয়া স্বদেশি গান রচনা করিয়া বাংলাদেশকে মুগ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নজরুল রচিত 'শিকল পরার ছল' অথবা 'জাতের নামে বজ্জাতি' প্রভৃতি গানগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথও বাংলাদেশের কয়েক স্থানে লোকনাট্য যাত্রার অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে তিনি একটি প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন।[১২]

আমি নিজেই যেহেতু যাত্রাপালার সঙ্গে আট-নয় বছর বয়স থেকে প্রায় পনের বছর জড়িত ছিলাম। ঐ যাত্রাশিল্পের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আমি খুব কাছ থেকে দেখার এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছে। আট বছর বয়সে আমি প্রথম রূপবান যাত্রার ছোট রহিম চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রাদলে প্রবেশ করি। আমি যখন যাত্রাপালার সঙ্গে যুক্ত হই তখন আমার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির দর্শকদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে।[১৩] আমি লক্ষ করেছি যাত্রাপালার শ্রোতা–দর্শকদের শ্রেণিগত পার্থক্যের পাশাপাশি রুচিগত পার্থক্যও রয়েছে। যাত্রাপালার পুরুষ দর্শকদের প্রায় আশি ভাগ দর্শক মূলত পালাভিনয় দেখতে আসে। দর্শকদের প্রায় ১৫% দর্শক আসে অশ্লীল দেহ প্রদর্শণী দেখতে আসে। ৫-৭ ভাগ দর্শক আসে যাত্রা দর্শনকে কেন্দ্র করে জোয়া খেলাসহ নানা প্রকার অশালীন কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে। যারা নিয়মিত যাত্রা দেখে গবেষণার জন্য বিভিন্ন সময়ে আমি নানা বয়সের ৩২ জন দর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে যে তথ্য পেয়েছি তা একটি বৃত্তচিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্ট করেছি। সেখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি বাংলাশের জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালা কালের বিবর্তনে কীভাবে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। যাত্রাপালা এখন আর আগের মতো জাতির চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং যাত্রাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ জেকে বসেছে। আগে যেখানে সামাজিক কল্যাণের জন্য যাত্রাপালা আমন্ত্রণ করা হতো, বর্তমানে সেখানে যাত্রাপালা গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষের পকেটের টাকা হাতিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জোয়া খেলার মাধ্যমে। ক্ষেত্র জরিপে দেখাগেছে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে যাত্রার দশর্ক-শ্রোতারা অনেকাংশে বেশি মানসিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে।

সারণি : ৩ যাত্রাপলার দর্শক শ্রোতাদের শ্রেণিচরিত্র। [১৪]

		নারী	পুরুষ	নারী	নারী		
যাত্রাপালার		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
দর্শক-	অভিনয় দেখা	২১	৭৫	৩	৭৫	২৪	৭৫
শ্রোতাদের	অশ্লীলতাদর্শন	৫	১৭.৮	১	২৫	৬	১৮.৭
শ্রেণিচরিত্র	জোয়াড়ী	২	৭.১	০	০	২	৬.২
	মোট	২৮	১০০	৪	১০০	৩২	১০০

যাত্রাপালার প্রায় ৯৫% দশর্ক পুরুষ। পুরুষ দর্শক-শ্রোতারাই মূলত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আলাদা আলাদা অভিরুচির মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে। প্রাপ্ত ক্ষেত্র জরিপের সাক্ষাৎকার থেকে দেখা গেছে যাত্রাপালার দর্শকদের মধ্যে ৭৫% পুরুষ মূলত অভিনয় দেখার উদ্দেশ্যেই যাত্রা প্যান্ডেলে যায়। ১৬% দর্শক যাত্রায় যায় অশ্লীল দেহ প্রদর্শনি দেখতে, এবং ৭% দর্শক যাত্রাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের জোয়া খেলা খেলতে যায়। নিম্নে বৃত্তচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

বৃত্তচিত্র : ৩ যাত্রাপাল্যার দর্শক শ্রোতাদের শ্রেণিচরিত্র। [১৫]

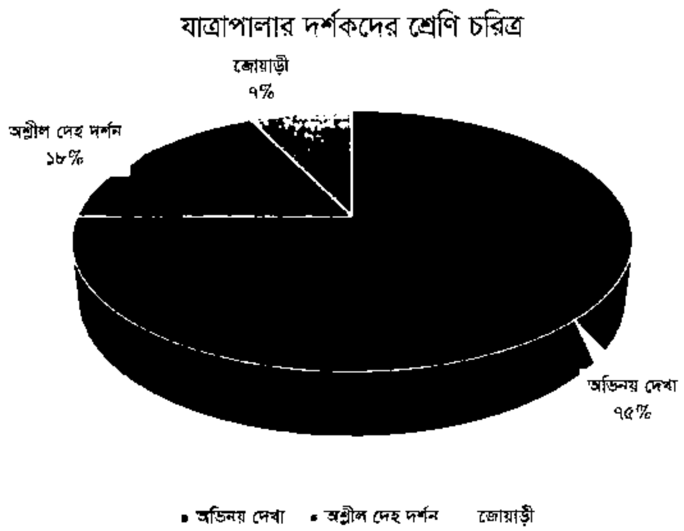

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তঃ অতীতে যাত্রাপালা বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি অনুকরণীয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম ছিল একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যাত্রাপালা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির নানা ইতিবাচক বিষয় দেখানো হত বলেই প্রায় সহস্র বছর যাবৎ এ নাট্যাঙ্গিক বাঙালির রস পিপাসা মিটাতে সক্ষম হয়েছিল। যখনই সমাজে কোন অনাচার অত্যাচার এসেছে তার মোকাবেলা করার জন্য গ্রামবাসীরা মিলে গ্রামে যাত্রার আয়োজন করত। যাত্রানাট্যের এই সম্মোহনী শক্তি উপলব্ধি করেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাটকে যাত্রার নানা চরিত্রের আদর্শে নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তখনকার যাত্রার দর্শকরা ছিল অত্যন্ত মননশীল ও সুরুচি সম্পন্ন। বর্তমান কালের যাত্রাভিনেতা ও দর্শকরা নৈতিকতার পরিবর্তে আর্থিক ও স্থূল রুচির মানসিকতা সম্পন্ন। তাই যাত্রাশিল্পকে আবার নতুন করে তার হৃত গৌরব উদ্ধার করতে হলে পালাকার, অভিনেতাসহ দর্শক শ্রোতাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। একমাত্র দর্শক–শ্রোতারাই পারে তাদের নিজেদের নৈতিকতার পরিচয় তুলে ধরে আমাদের বাংলাদেশের হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালাকে রক্ষা করতে। দর্শক–শ্রোতা যদি যাত্রার অশ্লীলতাকে পরিহার করে তাহলেই যাত্রা তার হারানো গৌরব উদ্ধার করতে পারবে। এছাড়া বর্তমান রুচি বিকৃতি যাত্রাশিল্পে চলতে থাকলে দূর অতীতের কৃষ্ণ গহব্বরে ঐতিহ্যবাহী যাত্রানাট্য চিরতরে হারিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৫৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৫. ড. প্রভাৎকুমার ভট্টাচার্য, *বাংলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব*, কলিকাতা,১৯৭৯, পৃ. ৪৩৩।

৬. ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *এম. এ, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাট্য, কলিকাতা*, ১৯৬০, পৃ ৩৯৫।

৭. সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৫৫।

৮. প্রাগুক্ত, ৩৪৫।

৯. জসীম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ৭৮।

১০. প্রাগুক্ত, ক্ষেত্র জরিপ।

১১. প্রাগুক্ত, ক্ষেত্র জরিপ।

১২. মিয়ারুল ইসলাম রাজন, আমার স্মৃতি, অপ্রকাশিত।

১৩. গিরিশচন্দ্র সেন, প্রগুক্ত, পৃ. ৬৩।

১৪. ক্ষেত্রজরিপ

১৫. ক্ষেত্রজরিপ

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ে সামাজিক–সাংস্কৃতিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয়ে সামাজিক–সাংস্কৃতিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। প্রত্যেক সাহিত্যকর্মের মধ্যে সমাজ জীবনের নানা দিক প্রতিফলিত হয়। একটি দেশে বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন সে জাতির শিল্প-সাহিত্য, নাটক ও চলচিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনেও রূপান্তর ঘটে। নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন আরও বেশি দ্রুত গতিতে তরান্বিত হয়। লোকনাট্য যাত্রাপালা যেহেতু একটি প্রাচীন নাট্যাঙ্গিক, তাই বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিক যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সকল সাহিত্যকর্মের মতো যাত্রানাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের মনস্তত্ত্বকে ধারণ করে মঞ্চায়ন করা হয়ে থাকে। কালিক আবেদনকে ধারণ করতে না পারলে নাট্যকারের নাটক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ বিষয়টি বরাবর মাথায় রেখে আমাদের দেশের যাত্রাপালাকারেরা যাত্রাপালা রচনা অভিনয়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন। সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই প্রাচীন কালের যাত্রানাট্য থেকে বর্তমান কালে যাত্রার বিষয়, আঙ্গিক গঠন ও মঞ্চ পরিকল্পনায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

অতি প্রাচীন কালে যাত্রা বলতে মূলত শুভ কাজে গমন বুঝানো হত। সে সময় যাত্রার নাট্যিক আবেদন সমকালীন সমাজ-মানুষের উৎসব কেন্দ্রিক বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন মূলত যাত্রার আবেদন ছিল সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মূল আ'কর্ষণ হিসেবে। তৎকালীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গবেষকের মত নিম্নরূপ।

> খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য রাজপুরুষেরা উচ্চধনিতে ঢাক বাঁজিয়ে বিহার যাত্রা করতো। এই বিহার যাত্রার অন্যতম লক্ষ ছিল মৌর্য রাজপুরুষদের রাজ্য দর্শন। আসলে বৎসরের নির্দিষ্ট একটি সময় মৌর্য রাজপুরুষেরা কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে বের হয়ে বিহারযাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করতো। এমনই বিহার যাত্রাকালে তাদের সঙ্গে থাকতো বহনের জন্য হাতি, রথ, রথের ঘোড়া। এছাড়া থাকতো মনোরঞ্জন দানকারী নৃত্যগীত পটিয়সীনারী পুরুষ, নট-নটী। গবেষকের ধারণা বিহার যাত্রার দল মাঝে মাঝে জনবহুল কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করতো। আর সন্ধ্যায় সেই শিবিরে জনসাধারনের উপযোগী নৃত্য-গীতের আসর বসতো।[১]

সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক উৎকর্ষের কারণে মানুষের মনে যখন ধর্মীয় চিন্তা চেতনা স্থান করে নিল তখন যাত্রাও তার আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মকে তার অঙ্গে ধারণ করে সময়ের দাবীকে পূরণ করেছে। একইসাথে পালা রচয়িতারাও তাদের অভিনয় অনুসঙ্গের সাথে ধর্মভাবকে মূখ্য হিসেবে গ্রহণ করেই যাত্রাপালা রচনা করেছেন। প্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

যুগের যাত্রার নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থূল বিষয় নিয়ে অভিনয়কলা প্রদর্শন করলেও পরবর্তীকালে ধর্মীয় বিষয়ই যাত্রা অভিনয়ের প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেল। ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভাবকে ধারণ করে যাত্রাভিনয়ের শুরুর ব্যাপারে গবেষকের মত নিম্নরূপ:

> প্রায় দেড়শত বছর হইতে চলিল, শ্রীদাম, সুবল নামে দুই সহোদর কালীয়দমন যাত্রা করিত। এখন অনেকেই বলেন, ইহারা যাত্রাওয়ালাদের আদি ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে তাঁহারা উভয়ে বড় গুণবান ছিল, তাহাই কালে তাহাদের এইরূপ খ্যাতি জন্মিয়াছে। বিশেষত শ্রীদাম সুবল যাত্রা করিত, সে সময় বাঙালার অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়াছিল। চারিদিকে একটু ধুম-ধাম পড়িয়াছিল। সেই সময় বর্গীরা দেশ ছাড়ে, মুসলমানদের রাজ্য যায়, কোম্পানির ব্যবস্থা জাঁকে।[২]

সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনেই যাত্রা শোভাযাত্রা থেকে দেবতার লীলানাটকে রূপান্তরিত হয়। এ পরিবর্তনের কারণে মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা জগতে এক ধরনের পরিবর্তন আসে। এক সময়ে ধর্ম মানুষের মনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছিল; যার প্রভাব পালাকারেরা উপেক্ষা করতে পারে নি। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় যাত্রার উপস্থাপনা রীতি ও আঙ্গিকের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। এ সম্পর্কে নাট্য গবেষক আশকার ইবন শাইখ বলেছেন-

> যাত্রাগান পরিবর্তনশীল লোকনাট্যের নানা রূপেরই একটি রূপ। কিন্তু এ সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই। কারও কারও মতে খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকেই ভারতে নাকি কৃষ্ণবিষয় নিয়ে যাত্রা রচিত হত। তারই ধারা জয়দেবের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলায় এসে পড়ে। বাংলাদেশের পাঁচালি গান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি এ কথাও কেউ কেউ বলেন।[৩]

চৌদ্দ শতক থেকে শুরু করে প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত যাত্রানাট্যের পালাগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় ছিল ধর্মীয় আখ্যানের অভিনয়। বিশেষ করে কৃষ্ণযাত্রা প্রায় পাঁচ শতাব্দী বাঙ্গালির নাট্য পিপাসা মিটিয়ে ছিল। কৃষ্ণযাত্রা এতো দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালির কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করার অন্যতম কারণ হল তৎকালীন সমাজে ভক্তিবাদের প্রাবল্যতা। ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিই ছিল তার ধর্ম নির্ভর। যাত্রাপালা রচনায় পালাকারেরা ধর্মীয়, সামাজিক বিষয়টি মাথায় রেখে পালা রচনা ও অভিনয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন বলেই মনে হয়। এমন একটি সংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা আমরা গৌরিশংকর ভট্টাচর্যের আলোচনা থেকে জানতে পারি। তিনি মনে করেন যাত্রায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়েছে। আর এ সকল রূপান্তরের পিছনে কাজ করেছে সমাজ-সংস্কৃতিক জীবনের নানা মুখী রূপান্তর। তিনি বলেন-

> এখন নানা দিক থেকে যাত্রার রূপান্তর ঘটেছে। একালের যাত্রার কথা বলতে গেলে স্বভাবতই সেকালের যাত্রার বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়। বাঙালি সমাজ বহুকাল ধরে ধর্মাদর্শ ও ন্যায়নীতি বোধকে প্রাধান্য দিয়ে জনজীবন পরিচালনা করতে চেয়েছে। তাই জনশিক্ষার মাধ্যম যাত্রার মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে ন্যায়,

Dhaka University Institutional Repository

> মানবতাবোধ ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে দীর্ঘকাল। এ সময়ে আসরে চৈতন্য যাত্রা বহু বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু তার ও মূলভাব ছিল প্রেম ও ভক্তি।[৪]

যাত্রাপালায় যখন ধর্মীয় বিষয় অভিনয় হতো তখন সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতিই তাদের জীবনাচারণের অংশ ছিল। কালের বিবর্তনে সাংস্কৃতিক রুচিবোধের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, ফলে যাত্রায় ধর্মীয় বিষয়ে পালার রচনা ও সীমিত হতে থাকে। মানুষ জীবনকে প্রেমের নিগড়ে দেখতে চাইল। ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে পৌরাণিক যাত্রার প্রাবাল্য লক্ষ করা গেল। পৌরাণিক বিষয়ে যাত্রাপালা রচনার পিছনে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল এমন মতও গবেষকদের মুখে শোনা যায়। সমাজিক সাংস্কৃতিক রুচির বিকৃতির জন্যই যাত্রাপালা ধীরে ধীরে তার অতীত ঐতিহ্য কীভাবে হারিয়েছে সে বিষয়ে সুরেশচন্দ্র মৈত্রের অভিমত নিম্নরূপ:

> কলকাতায় তখন ধর্মবুদ্ধি শুধুই প্রমোধবুদ্ধি। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে দেখা দিতে শুরু করে। প্রথমে খ্রিষ্টান পাদরীদের সঙ্গে পঞ্জাকসা। পরে সংঘর্ষের আসর বদলে গেল, উন্নতিকামকদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরামদের যাত্রা শিশুদের কেবল প্রীতির কারণ হতে পারে-বয়সে শিশু ও মানসিকতায়। এই প্রমোদকলা যুগ প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি-কারণ তার মূখ ভবিষ্যতের দিকে নয়, ছিল অতীতের দিকে।[৫]

সামাজিক রুচি বিকৃত হওয়ার কারণে সমকালে যাত্রা দলের অধিকারীদের দ্বারা যাত্রায় নিম্নমানের কাহিনী ও চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেন:

> যে দেশের লোকের যে কালের যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোক মটিভের মতো, ব্যবহারে কেবল 'ওয়েদর বকে কাজ করে। দেখুন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ করেন। নাটক ঘোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আজকাল আমরা বারোয়ারি তলায় নয় বাড়িতে বেদেনীর নাচ মদন আগুনের তানে পরিতুষ্ট হচ্ছি। যাত্রাওয়ালাদের ছকুবাবু ও সুন্দরের সং নাবাতে হুকুম দিচ্ছি।[৬]

শুধু সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণেই যাত্রা মালিক ও রচয়িতারা যাত্রার চিরস্থায়ী রীতিকে ভঙ্গ করে গুরুগম্ভীর বিষয়ের পরিবর্তে ভাড়ামি ও অশ্লীলতার আমদানি করেছেন বলে তৎকালীন যাত্রাকরদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেছেনঃ

> আগে মাঝে মাঝে সঙ এর জন্য আসর ছেড়ে দিত যাত্রা। অচিরেই যাত্রাকে বিদায় নিতে হলো। সঙ আসর দখল করে বসল। অর্থাৎ যাত্রার মধ্যে থেকে যখন গুরুগম্ভীর সুর সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করল, তখন সবটাই দাঁড়াল কৌতূক ও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপার। প্রমোদকলায় 'প্রমোদ' শব্দটিই সর্বেস্বর হয়ে পড়ল। সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপালায় শুধু অশ্লীলতা এসেছে এমন ঢালাও অভিমতকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যাত্রাপালায় ধর্মের যে, একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তার কিছুটা ভাটাও পড়েছে। দেবতাদের কথা শুনে মানুয়ের মন সর্বদাই পরিতৃপ্ত হবে এমন নয়। মানুষ সাহিত্য নাটকে তার নিজের সুখ দু:খ, আনন্দ বেদনার ছবি দেখতে চাইল। ফলে যাত্রাপালায় ধর্মীয় বিনোদনের পরিবর্তে সামাজিক জীবনের প্রতিরূপ দেখার চেষ্টা করল। তাই যাত্রা পালার ক্ষেত্রে বিদ্যাসুন্দর পালার অশ্লীলতার ব্যাপারে যে অভিযোগ গবেষকগণ করেছেন তা সর্বাংশে সত্য নয় বলেই প্রতিয়মান হয়।[৭]

এক সময় বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার মাধ্যমেই প্রথমে মানুষের প্রেম-ভালোবাসার কথা অভিনীত হয়। ফলে সমকালে হাজার হাজার সাধারণ নিরক্ষর মানুষ যে যাত্রা দেখে তৃপ্তবোধ করেছেন তার প্রমাণ আমরা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর অভিমত থেকে জানতে পেরেছি। যদিও তিনি তাঁর আলোচনায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালা অশ্লীল বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অশ্লীলতার জন্য পালাকারদের দায়ী করা যায় না বরং তা সমসাময়িক যুগধর্ম ও সাংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। ধর্মীয় খোলশ মুক্ত হতে পেরেছিল বলেই ঊনিশ শতকের যাত্রাপালা সামাজিক ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করে দীর্ঘসময় মানুষের সাফল্যের শীর্ষ অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রাশিল্পের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়, দেবী সুলতানা,[৮] সিরাজউদ্দৌলা,[৯] আনারকলি,[১০] ইত্যাদি যাত্রাপালা।

সামাজিক আবেদনের কথা বিবেচনা করে বিশ শতকের যাত্রাপালায় বিভিন্ন লোক কাহিনী নিয়েও রচিত হয় অনেকগুলো অসাধারণ যাত্রাপালা। এর মধ্যে বেদ কন্যা,[১১] বেদের মেয়ে জোসনা,[১২] সাপুড়ের মেয়ে,[১৩] মহুয়া,[১৪] ইত্যাদি যাত্রাপালার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যাত্রার ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবজনক। এ সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে প্রায় ত্রিশের অধিক যাত্রাপালা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত যাত্রাপালাগুলো বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সমসাময়িক কালে দারুণভাবে আলোড়ন তৈরি করেছিল। এ সকল পালার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল সমকালের মানুষের আবেগ ঐ সকল অভিনয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। 'জয়বাংলা'[১৫] আমি মুজিব নই,[১৬] সংগ্রামী মুজিব,[১৭] মুক্তিফৌজ,[১৮] বঙ্গবন্ধুর ডাক,[১৯] শেখ মুজিব,[২০] নদীর নাম মধুমতি[২১] প্রভৃতি পালা রচনার ব্যাপারে পালাকারেরা সমসাময়িক কালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার কথা

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছিলন বলে অনেক গবেষক মনে করেন। বঙ্গবন্ধুর পর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ক্রমান্নয়ে জীবনীভিত্তিক পালা অভিনিত হতে দেখা গেছে। এর মধ্যে বিদ্রোহী নজরুল,[১৯] মধুসূদন,[২০] শুভাষ বোস,[২১] আমি মুজিব বলছি,[২২] মুজিবের ডাক,[২৩] প্রভৃতি যাত্রাপালা দুই বাংলাতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল।

বাংলাদেশের কিংবদন্তি সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে বেশকিছু জনপ্রিয় যাত্রাপালা রচিত হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্রোহী নজরুল,[২৪] মাইকেল,[২৫] ইত্যাদি যাত্রাপালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশ জ্ঞান বিজ্ঞানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের আদর্শ ও অবদান জানতে পারে। ফলে সময়ের প্রয়োজনেই যাত্রাপালা দেশীয় গণ্ডী পার হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পদার্পণ করে। এ সময় বাংলাদেশের অখ্যাত পাড়াগায়ের মঞ্চে অভিনিত হতে থাকে শম্ভুনাথ বাগের হিটলার,[২৬] যাত্রাপালা।

সতের শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত ৪০০ বছরের যাত্রাপালা রচনায় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের একটি আনুপাতিক ধারণা দেয়ার জন্য আমরা প্রত্যেক শতকে ১০০ পালা রচিত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে বিষয় ভিত্তিক যাত্রাপালা রচনার শতকরা হিসাব সারণির মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণি : শতক হিসেবে বিষয় ভিত্তিক রচনার তালিকা।[২৭]

	ধর্মীয় যাত্রাপালা		পৌরাণিক যাত্রাপালা		ঐতিহাসিক যাত্রাপালা		সামাজিক যাত্রাপালা	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সাংস্যা	%
১৭ শতক	১০০	৪৯.৭	০	০	০	০	০	০
১৮ শতক	৮০	৩৯.৮	১৫	২০	৫	৬.৩	০	০
১৯ শতক	২০	৯.৯	৫০	৬৬.৬	২০	২৫.৩	১০	১৬.৬
২০ শতক	১	০.৪	১০	১৩.৩	৩৯	৪৯.৩	৫০	৮৩.৩
	২০১	১০০	৭৫	১০০	৭৯	১০০	৬০	১০০

একই বিষয়টি রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নে দেখানো হল:

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র : শতক হিসেবে বিষয় ভিত্তিক রচনার তালিকা।[২৮]

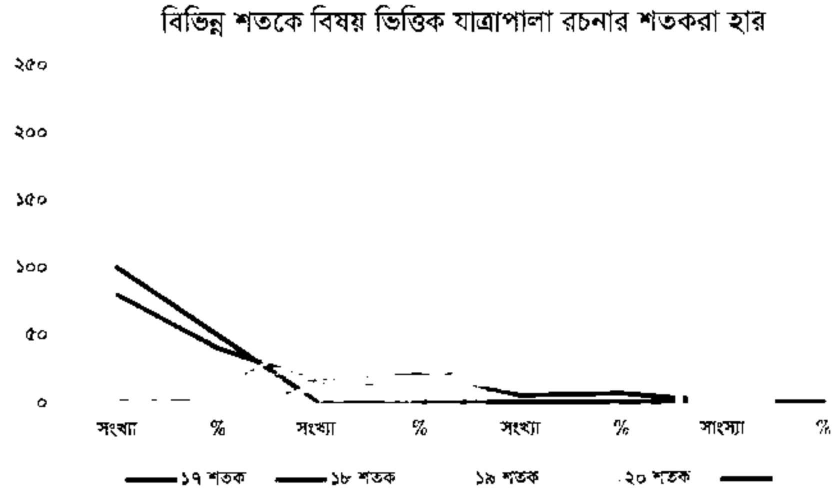

সিদ্ধান্ত: যে কোন সাহিত্য রচিত হয় তার কালের সাক্ষী হিসেবে। এজন্য কোনো কোনো গবেষক সাহিত্যকে সময়ের প্রতিবিম্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকনাট্য যাত্রাপালা সমসাময়িক সমাজের সামাজিক–সাংস্কৃতিক চিন্তা–চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। একেক যুগের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা একেক রকম হয়। সামাজিক অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তাচেতনার যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক রুচির কারণেই ধর্মাশ্রয়ী যাত্রাপালা কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা রূপে পরিবর্তিত হয়ে মানবতাবাদী জীবন জিজ্ঞাসার সত্যকে স্বীকার করে লোকমানবের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে লোকনাট্যে পরিণত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্রঃ

১. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫।

২. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

৩. আসকার ইবন শাইখ, *বাংলা মঞ্চনাটকের পশ্চাৎভূমি,* ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৬।

৪. গৌরীশংক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

৫. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাচার নকশা,* কলিকাতা, পৃ. ১৪৪।

৭. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫।

৮. অঞ্জন সেন।

৯. সিকান্দার আবু জাফর।

১০. আমিনুল হক।

১১. শাহ সিকান্দার আজাদ, গ্রন্থ কুটির, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯০।

১২. মোঃ জালাল উদ্দিন, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা ।

১৩. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ৩য় সংস্ককরণ, ১৯৯৯।

১৪. মিয়ারুল ইসলাম রাজন, *(মৈমনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে)* অভিনিত বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।

১৫. উৎপল দত্ত।

১৬. মন্মথ রায়।

১৭. নরেশ চক্রবর্তী।

১৮. নিরাপদ মণ্ডল।

১৯. ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০. সাধন চক্রবর্তী।

২১. পরিতোশ ব্রহ্মচারী।

২২. অরুণ রায়।

২৩. ব্রজেনাদ্র কুমার দে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪.অমলেন্দু বিশ্বাস।

২৫.অমলেন্দু বিশ্বাস।

২৬.শম্ভুনাথ বাগ।

২৭.কল্পিত সারণি।

২৮.কল্পিত সারণির উপর ভিত্তি করে তৈরি রেখাচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

প্রাচীনকালের সৌর উৎসব কেন্দ্রিক পরিবেশনারীতি যাত্রা। কালের বিবর্তনে বহু বছর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার গেয় রূপ কিছুটা পরিবর্তন করে ষোড়শ শতাব্দীতে নাট্যরূপ লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়ের মাধ্যমে মন্দির থেকে প্রাঙ্গনে উঠে আসে। যুগের পরিবর্তন ও জনরুচির ভিন্নতার কারণে যাত্রা এক সময় তার পালারূপ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও মূল সুর থেকে বিচ্যূত হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রাপালা যুগ সত্যকে স্বীকার করে আর একবার তার আঙ্গিকতায় পরিবর্তন আনে। এ সময় পালা পালারীতি থেকে পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি নাট্যিক রূপ লাভ করে। তারপর যাত্রাপালার বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন আসে। ধর্মীয় বিষয়ের পরিবর্তে পৌরাণিক বিষয় যাত্রা অভিনয়ের মূল উপজীব্য হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে মানবীয় জীবন জিজ্ঞাসা যাত্রার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশে যাত্রাপালা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে বলেই বার বার শাসকগোষ্ঠীর খড়গ নেমে এসেছে যাত্রার উপর। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বাঙালির প্রতিবাদের প্রধান মাধ্যম ছিল যাত্রাপালা। এ সময় চারণ কবি মুকুন্দ দাস আন্দোলনের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে যাত্রাপালাকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান শাসন আমলেও যাত্রাকে শাসকগোষ্ঠীর চোখ রাঙানো সহ্য করতে হয়েছিল। এতকিছুর পারও যাত্রাপালা বাঙালির জনপ্রিয় নাট্যমাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছে। তবে সময়ের বিবর্তনে সামাজিক নানা ধরনের অবক্ষয়ের কারণে যাত্রাপালা এক সময় তার পূর্ব ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারে নি। সম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে যাত্রা নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পুঁজিবাদী শক্তির কাছে সে তার সতীত্বকে বিসর্জন দেয়। যাত্রাশিল্পের মালিকানা পুঁজিবাদের খপ্পরে বন্দী হয়ে যাওয়ার পর ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের জনপ্রিয় ধারাটি অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। ফলে রুচিশীল মানুষেরা যাত্রা দেখা বন্ধ করতে বাধ্য হল। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা তথাকথিত প্রিন্সেসদের অশ্লীল দেহ প্রদর্শনীর নষ্ট আখড়ায় পরিণত হল যাত্রাপালা। এ সময় যাত্রাগানকে কেন্দ্র করে অসামাজিক কার্যকলাপ চলতে লাগল। যাত্রাশিল্প পরিণত হল জোয়া খেলার আড্ডাখানায়। তবে আমি মনে করি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলে আবারও যাত্রাপালা জনশিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যমগুলোর অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে, বাঙালির জনপ্রিয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রাপালাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষিত মহলের এগিয়ে আসা উচিৎ। তা না হলে এক এক করে বাঙালি জাতিসত্তার মূল ঐতিহ্যগুলি কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাবে। তাই আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার জন্য কালজয়ী শিল্পমাধ্যম যাত্রাপালাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত

২. *ইমাম হাসানের বিষপান*, বিষাদসিন্ধু উপন্যাস অবলম্বনে

৩. *লাইলী-মজনু*, এস এম মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)

৪. *বেহুলা-লক্ষিন্দর*, সংগৃহীত

৫. *রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা*, মোঃ সামসুল হক,

৬. *সাগর ভাসা*, মোঃ সামসুল হক,

৭. *রাজা হরিশচন্দ্র*, কালীপদ দাস;

৮. *গুনাই বিবি*, আবুল কালাম (সম্পাদিত)

৯. *নসীমন*, সংগৃহীত

১০. *কাজল রেখা*, মোঃ সামসুল হক

১১. *মতি মালা*, মোঃ সামসুল হক

১২. *কাসেম-মালার প্রেম*, আব্দুল করিম খান

১৩. *মসনাদের মোহ*, সংগৃহীত

১৪. *বেশ্যার ছেলে ব্যারিস্টার*, সংগৃহীত

১৫. *ভিখারির ছেলে*, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

১৬. *নয়ন-মালা*, হরেকৃষ্ণ দাস

১৭. *বাহার মালা*, মোঃ সামসুল হক

১৮. *ভাসান যাত্রাপালা*, কাজী রফিক

১৯. *ভানুমতি*, ওবায়দুর রহমান খা

২০. *বেদের মেয়ে জোসনা*, কাজী মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

২১. *আপন দুলাল*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

২২. *কমলার বনবাস*, মোঃ সামসুল হক

২৩. *পলাশীর পরে*, সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪. *নয়ন তাঁরা*, সংগৃহীত

২৫. *হিটলার*, শম্ভুনাথ বাগ

Dhaka University Institutional Repository

২৬. *চুড়িওয়ালী*, নুরুদ্দিন আহমদ

২৭. *আনারকলি*, অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

২৮. *চাষার ছেলে*, শ্রী-ভাস্কর

২৯. *গৌরী মালা*, আরশাদ আলী

৩০. *রাধাকৃষ্ণ যাত্রাপালা*, সংগৃহীত

৩১. *সোহরাব রুস্তম*, ব্রজেন্দ্রকুমার দে

৩২. *আলোমতি প্রেম কুমার*, মোঃ সামসুল হক

৩৩. *মাইকেল*, অমলেন্দু বিশ্বাস

৩৪. *সিঁদুর নিও না মুছে*, নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়

৩৫. *দস্যুরাণী ফুলন দেবী*, পরিতোষ বহ্মচারী

৩৬. *সাতপাকে বাঁধা*, রঞ্জন দেবনাথ

৩৭. *শাঁখা দিয়োনা ভেঙে*, কমলেশ ব্যানার্জী

৩৮. *গলি থেকে রাজপথ*, রঞ্জন দেবনাথ

৩৯. *রিক্সাওয়ালা*, প্রতিমা অপেরা

৪০. *অশ্রু নদীর তীরে*, প্রতিমা অপেরা

৪১. *বাগদত্তা*, প্রতিমা অপেরা (যশোর)

৪২. *জেল থেকে বলছি*, সংগৃহীত

৪৩. *নিচু তলার মানুষ*, সংগৃহীত

৪৪. *গরীবের মেয়ে*, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

৪৫. *মা মাটির মানুষ*, ভৈরবনাথ গঙ্গপাধ্যায়

৪৬. *লালন ফকির*, বাংলা বিভাগ ঢা. বি.

৪৭. *পাঁচ পয়সার আলতা*, চণ্ডী অপেরা

৪৮. *গরীব কেন কাঁদে*, প্রতিমা অপেরা

৪৯. *মহুয়া সুন্দরী*, বাংলা বিভাগ ঢা. বি.

৫০. *হিংসার পরিণাম*, বশীরউদ্দিন আহমদ

৫১. *বিজয় বসন্ত*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

Dhaka University Institutional Repository

৫২. *খায়রুন সুন্দরী*, এস এম মনিরুজ্জামান

৫৩. *অমূল্য হীরা*, মোঃ সালেকুল ইসলাম

৫৪. *শাহ্‌জাদী সাগরিকা*, এস এম মনিরুজ্জামান

৫৫. *কলঙ্কিত মসনদ*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৫৬. *বেঈমানের ছেলে*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৫৭. *সাপুড়ের মেয়ে*, কাজী মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

৫৮. *বেঈমানের চক্রান্ত*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৫৯. *পরাজিত বেঈমান*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৬০. *চাঁদ কুমারী চাষার ছেলে*, শাহ্ সিকান্দার আজাদ

৬১. *কমলার প্রেম*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৬২. *বনবাসে মানিক মালা*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৬৩. *ফিরিয়ে দাও সিংহাসন*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৬৪. *জালিমের চক্রান্ত*, টি. কে. এস শয়ন দাস

৬৫. *ভিক্ষারীর মেয়ে*, মোঃ জালাল উদ্দিন

৬৬. *দুর্গা নয় দেবী*, শ্রী অতুল প্রসাদ শিকদার

৬৭. *মেঘমালা রসের বেদেনী*, শাহ্ সিকান্দার আজাদ

৬৮. *মা হল কলংকিনী*, মজিবুর রহমান শেখ

৬৯. *পুস্পমালা*, মোঃ বাহাউদ্দীন আহ্‌মদ

৭০. *মধুমালা*, শ্রী চারুচন্দ্র চৌধুরী

৭১. *কে বেঈমান*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭২. *মা কেন কলঙ্কিনী*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭৩. *মীর জাফরের চক্রান্ত*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭৪. *চাকরের মেয়ে*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭৫. *মাতৃহত্যার প্রতিশোধ*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭৬. *শূণ্য সিংহাসন*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৭৭. *বিজয় বসন্ত*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. *কাঠুরিনী চাঁদকুমারী*, মোঃ শফিকুল ইসলাম

৭৯. *কারবালার কান্না*, শ্রী অতুল প্রসাদ শিকদার

৮০. *বিদ্রোহী বেগম*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৮১. *অত্যাচারীর চাবুক*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৮২. *দুশমনের চক্রান্ত*, মজিবুর রহমান শেখ

৮৩. *মালীর ছেলে*, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

৮৪. *রাজরক্ত*, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

৮৫. *প্রীতি চন্দন*, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

৮৬. *আলো মালা*, মোঃ সামসুল হক

৮৭. *বেঈমানের অত্যাচার*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৮৮. *ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৮৯. *মা হলো বন্দী*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৯০. *রূপবান যাত্রাপালা*, মোঃ আমির হোসেন (অপ্রকাশিত)

৯১. *অরুণ বরুণ কিরণমালা*, মোঃ সামসুল হক

৯২. *বিশ্বাস ঘাতক*, শ্রী হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস

৯৩. *সৎ মা*, মোঃ সামসুল হক

৯৪. *কহিনুর*, মোঃ এরশাদ আলী (অপ্রকাশিত)

৯৫. *হামিদা সুন্দরী*, এস এম মনিরুজ্জামান

৯৬. *বিদূষী ভার্যা*, রঞ্জন দেবনাথ

৯৭. *রহিম বাদশা রূপবান কন্যা*, এ. এম.মনিরুল হক

৯৮. *টিপু সুলতান*, মহেন্দ্র গুপ্ত

৯৯. *শশীবাবুর সংসার*, মণি দত্ত

১০০. *রাণী ভবাণী*, আনন্দময় মুখোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

১. নগেন্দ্রনাথ বসু , *'বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ ভাগ,* বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী.

২. আহমদ শরীফ , *'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য'*, ঢাকা, বর্ণমিছিল

৩. সুকুমার সেন, *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড,* আনন্দবাজার পাবলিশার্স,কলকাতা .

৪. সুকুমার সেন , *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড,* আনন্দবাজার পাবলিশার্স,কলকাতা

৫. পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ,* প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৯৭১

৬. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন,* ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।

৭. শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অভিনয় শিক্ষা,* কলকাতা, ১৯৩২।

৮. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১।

৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০।

১০.শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন,* কলিকাতা, ১৯৬০।

১১.শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায়, *সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ,* কলিকাতা, ১৯৫৯।

১২.শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট)লিঃ কলিকাতা-১২, ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২।

১৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য, *নাট্যকার শ্রী মধুসূদন,* কলকাতা, ১৯৬৮।

১৪.হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৪৭।

১৫.সুনীল দত্ত, *সেকালের নাট্যচর্চা,* কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৩০।

১৬.বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, *গণ আন্দোলন ও নাটক,* কলকাতা, ১৯৫৯।

১৭.সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, *আমার কথা ও বিনোদিনী দাসী,* কলকাতা, ১৯৫৯।

১৮.সুনীল দত্ত, *সেকালের নাট্যচর্চা,* কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৩০।

১৯.গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রাগুক্ত, *আমার কথা ও বিনোদিনী দাসী,* কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ১৩২।

২০.ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালা,* কলিকাতা, ১৯১০।

২১.সৈয়দ আজিজুল হক, *মৈমনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য,* বাংলা একাডেমি, ১৯৯০।

২২.অরুণ মিত্র, *ভারতীয় থিয়েটার,* ন্যাসনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৬০।

২৩.রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার,* কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৬৬।

২৪.রুদ্রপ্রসাদ সেন গুপ্ত, *নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, কলিকাতা,* ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০।

Dhaka University Institutional Repository

২৫.সঞ্জীব চক্রবর্তী, (প্রকাশক) *অভিনয় শিল্প*, কলিকাতা, ৮ মে, ১৯৬০।

২৬.প্রজ্ঞা প্রকাশন, *বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার, দ্বিতীয় খণ্ড : সন্ধিযুগ*, কলিকাতা, ১৯৬০।

২৭.ডক্টর বাসন্তী াকী, *বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক, কলকাতা,* অকেটাবর, ১৯৯০।

২৮.শ্রীমতী রত্না নন্দী, *বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা,* কলকাতা, ১৯৮১।

২৯.ড. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য, *বাংলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব,* কলিকাতা, ১৯৮৯।

৩০.তন্দ্রা চক্রবর্তী, *বাংলা পেশাদারি থিয়েটার: একটি ইতিহাস*, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০২।

৩১.দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, কলকাতা*, জানুয়ারি, ১৯৯৫।

৩২.পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, *নট-নাট্য-চলচিত্রকথা, করিকাতা*, জানুয়ারি, ১৯৬০।

৩৩.দীপক কুমার মিত্র, *আধুনিক ভারতীয় নাটক, কলিকাতা*, জানুয়ারি,২০০০।

৩৪.সূত্রধর সম্পাদিত, *বাংলা নাটক: নাট্যকার-১, কলকাতা*, ভাদ্র, ১৩৬৪।

৩৫.শ্রী বৈদ্যনাত শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, কলিকাতা।

৩৬.ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, *নাটক ও নাটকের অভিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, কলিকাতা, ১৯২০।

৩৭.শিশির বসু, *একশ বছরের বাংলা থিয়েটার*, কলিকাতা।

৩৮.সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম,* কলিকাতা, ১৯৫৮।

৩৯.বীরেশ্বর বন্দ্যো'পাধ্যায়, '*যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা।

৪০.কামাল লোহানী, *'বাংলার লোকঐতিহ্য: প্রসঙ্গ যাত্রাশিল্প'* ঢাকা।

৪১.সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, *'বাংলা ছড়ায় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন,* ঢাকা, ১৯৮৬।

৪২.ড.মযহারুল ইসলাম, *'লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত'*

৪৩.হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *' যাত্রা': কৃষ্ণকমল গোস্বামী'* লোকসংস্কৃতি গবেষনা

৪৪.সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , *'যাত্রার ইতিবৃত্ত,'* বঙ্গদর্শন , ফাল্গুন সংখ্যা, ১২৮১

৪৫.অমলেন্দু বিশ্বাস ,*' বাংলাদেশের যাত্রা: অতীত ও বর্তমান'*, ত্রৈমাসিক থিয়েটার (রামেন্দু মজুমদার সম্পা.) ঢাকা, জুন ১৯৮৭

৪৬.সেলিম আল দীন , *'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য'* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা,

৪৭.নিরঞ্জন অধিকারী , *'লোকনাট্য, সমাজ ও জীবনের রূপায়ণ'* , মানিকগঞ্জ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১৯৯৩ স্মরণিকা (নিরঞ্জন অধিকারী সম্পা.) ঢাকা, ১৯৯৩

৪৮.সেলিম আল দীন, *' যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে '*, জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা ১৯৯৪-৯৫.

Dhaka University Institutional Repository

৪৯.অমলেন্দু বিশ্বাস , '*বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

৫০.ননী গোপাল সরকার, '*লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে নেত্রকোণার যাত্রাপালা*' (স্বপন কুমার পাল সম্পাদিত)

৫১.তপন বাগচী, '*বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা*' , ঢাকা।

৫২.সনৎকুমার মিত্র (সম্পা.) '*লোকসংস্কৃতি গবেষণা*', ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা,১৯৯৪

৫৩.ড.অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, '*সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৮

৫৪.অনুপম হায়ৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা , ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

৫৫.ড. আবুল আহসান চৌধুরী, '*কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫৬.নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, '*The Yatras or the Popular Dramas of Bengal*' লন্ডন, ১৮৮২।

৫৭.সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৫৮.মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, (ড. সৌমিত্র শেখর সম্পা.)মার্চ ,২০০৫।

৫৯.এম আশরাফ আলী, '*মীরাবাঈ*' প্রদীপণ প্রকাশনী, ঢাকা

৬০.ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, '*বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*' কলকাতা।

৬১.অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

৬২.ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৬৭।

৬৩.অহীন্দ্র চৌধুরী, *বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র*, কলিকাতা, ১৯৫৮।

৬৪.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*তপতী*', কলকাতা, ১৯ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন, ১৩৩৬।

৬৫.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*রঙ্গমঞ্চ*' বিচিত্র প্রবন্ধ, কলিকাতা. বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৪০১।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*রক্তকরবী*' কলিকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ, ১।

৬৭.সুকুমার ' '*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*', ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

৬৮.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*স্বদেশি সমাজ*', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা আকাদেমি কলকাতা।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*কালান্তর*', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা আকাদেমি কলকাতা।

৭০. ক্ষেত্রগুপ্ত, '*যাত্রার বিবেক- থিয়েটারের বিবেক এবং কিঞ্চিৎ নিয়তি*' (সৈকত আজগর সম্পাদিত; বাংলা একাডেমি; ঢাকা. এপ্রিল, ২০০২)।

৭১.মো: জালাল উদ্দিন, " *ভিখারীর ছেলে*", যাত্রাপালা, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ২০০০।

৭২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', '*মুক্তধারা*', বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯২২, ।

৭৩.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', '*রাজা*', বিশ্বভারতী, গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৭, ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৪.সাইমন জাকারিয়া, *নাট্যচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

৭৫.দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪।

৭৬.নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ ভাগ*, (বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী) ১৯৮৮।

৭৭.সনৎ কুমার মিত্র, *যাত্রা: থিয়েট্রিক্যাল অপেরা*, (প্রবন্ধ) সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৮৩।

৭৮.অশীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৯৬।

৭৯.ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৭২।

৮০.সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪*, ঢাকঃ মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি,২০০৪।

৮১.আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, বর্ণমিছিল প্রাকাশনী , ১৯৭৮, ঢাকা।

৮২.অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮।

৮৩.মমতাজ উদ্দীন আহমদ, *যাত্রার বিবিধ অর্থ, জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৯৭৯-৮০।

৮৪.শ্রী শাধন কুমার ভট্টাচর্য, *নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা।

৮৫.ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালা*, কলকাতা, ১৯১০।

৮৬.কাজী আবুবকর সিদ্দিক, '*সাপুড়িয়ার মেয়ে*' , সালমা বুক ডিপো, ঢাকা।

৮৭.'*যাত্রা বন্ধ*' ,সাপ্তাহিক চিত্রাবলী ঢাকা ২৬ অক্টোবর, ১৯৯১

৮৮.গোলাম সারোয়ার, '*যাত্রায় সংকট: একাল ও সে কাল*, ঢাকা

৮৯.ইব্রাহীম খাঁ '*যাত্রাগান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৯০.গোপাল হালদার, '*বাংলা সহিত্যের রূপরেখা*' *১ম ও ২য় খণ্ড*, কলকাতা।

৯১. মতিউর রহমান, '*ঘুমন্ত সমাজ*'

৯২.প্রভাত কুমার দাস, '*বাংলা যাত্রার বিবর্তন*'

৯৩.দীনেশচন্দ্র সেন , '*বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*' ঢাকা

৯৪.মন্মথ রায়, '*লোকনাট্য যাত্রাগান*' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

৯৫.আশুতোষ ভট্টাচার্য, '*বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*' কলিকাতা

৯৬.গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, '*যাত্রা: রবীন্দ্রনাটক*'

৯৭.মঈনউদ্দিন আহম্মদ, '*যাত্রার যাত্রা*'

Dhaka University Institutional Repository

৯৮.রেজোয়ান সিদ্দিকী, *'পেয়ার আলীর যাত্রাদর্শন'*

৯৯.নাজমুল আহসান, *'যাত্রা: একটি জীবনধর্মী'*, *যাত্রা: উদ্ভব ও বিকাশ*

১০০. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১৯৫৬।